জুলাই ২০২৩ ■ আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪৩০

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জাতীয় বাজেট

রঙের বাড়ই হুমায়ূন আহমেদ

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডেঙ্গু প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন

ডেঙ্গু একটি ভাইরাসজনিত জ্বর যা এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। এই মশা সাধারণতঃ ভোরবেলা ও সন্ধ্যার পূর্বে কামড়ায়। সাধারণ চিকিৎসাতেই ডেঙ্গু জ্বর সেরে যায়, তবে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম এবং হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর মারাত্মক হতে পারে। বর্ষার সময় সাধারণত এ রোগের প্রকোপ বাড়ে। এডিস মশার বংশ বৃদ্ধি রোধের মাধ্যমে ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধ করা যায়।

টবে জমা পানি

পরিত্যক্ত বালতি/গামলায় জমা পানি

এডিস মশার লার্ভা

পিউপা

পরিত্যক্ত টায়ারে জমা পানি

পরিত্যক্ত পাত্র

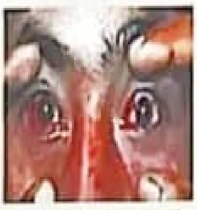

হেমোরেজিক ডেঙ্গু রোগী

এডিস মশার জীবনচক্র

এডিস মশা ডিম পাড়ার ও বংশবিস্তারের স্থান

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়:

- আপনার ঘরে এবং আশেপাশে যে কোন জায়গায় পানি জমতে না দেয়া। ফলে এডিস মশার লার্ভা জন্মাতে পারবে না।
- ব্যবহৃত পাত্রের গায়ে লেগে থাকা মশার ডিম অপসারণে পাত্রটি ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ঘষে পরিস্কার করতে হবে।
- ফুলের টব, প্লাস্টিকের পাত্র, পরিত্যক্ত টায়ার, প্লাস্টিকের ড্রাম, মাটির পাত্র, বালতি, টিনের কৌটা, ডাবের খোসা/নারিকেলের মালা, কন্টেইনার, মটকা, ব্যাটারী শেল ইত্যাদিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে। কাজেই এগুলো বর্জ্য হিসেবে ব্যবস্থা নেয়া।
- অব্যবহৃত পানির পাত্র ধ্বংস অথবা উল্টে রাখতে হবে যাতে পানি না জমে।
- দিনে অথবা রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারী ব্যবহার করুন।

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

জুলাই ২০২৩ ❑ আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪৩০

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা জুন ২০২৩ জাতীয় সংসদ ভবনে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেটপূর্ব মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন— পিআইডি

সম্পাদকীয়

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য জাতীয় সংসদ ৭ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকার বাজেট পাস করেছে। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল পঞ্চমবারের মতো বাজেট উপস্থাপন করেন। স্বাধীনতার পর এটি বাংলাদেশে ৫৩তম বাজেট। এর মধ্যে ১৯৭১-১৯৭২ অর্থবছরে আংশিক বাজেট উপস্থাপন করা হয়। এবার বাজেটে রাজস্ব আয় নির্ধারণ করা হয়েছে ৫,০০,০০০ কোটি টাকা। বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট ধরা হয়েছে ২,৬৩,০০০ কোটি টাকা। বাজেটের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে এ সংখ্যায় রয়েছে প্রবন্ধ।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ। তিনি একাধারে কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, চলচ্চিত্র নির্মাতা, গীতিকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ২০১২ সালের ১৯শে জুলাই নন্দিত এই কথাসাহিত্যিক মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে নিয়ে এ সংখ্যায় রয়েছে নিবন্ধ।

১লা জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস। ১৯২১ সালের এ দিনে অনেক বাধাবিপত্তি তথা ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে জাতির বীর সন্তানদের প্রচেষ্টা ও ত্যাগের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ বিশ্ববিদ্যালয়। শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রেই নয়, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ।

এছাড়া রয়েছে অন্যান্য বিষয়ের নিবন্ধ, গল্প, কবিতা ও নিয়মিত প্রতিবেদন। আশা করি, *সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকার জুলাই সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

DFP

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
ডালিয়া ইয়াসমিন

সম্পাদক
ইসরাত জাহান

কপি রাইটার
মিতা খান

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

অলংকরণ : নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
E-mail: dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

প্রবন্ধ/নিবন্ধ

বাজেট বাস্তবায়নে চাই সতর্ক নীতিকৌশল ৪
ড. আতিউর রহমান

অর্থনৈতিক সংকট নিরসনে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ ৭
মো. ফারুক আহমেদ

বাজেট আলোচনা: অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষুদ্র একক ৯
মোস্তফা মোরশেদ

বাঘ আমাদের জাতীয় পশু ১১
প্রফেসর ড. আ ন ম আমিনুর রহমান

রঙের বাড়ই হুমায়ূন আহমেদ ১৪
পরীক্ষিৎ চৌধুরী

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮
ড. অসীম দাস

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট: একটি পর্যালোচনা ২০
এম এ খালেক

টেকসই সমবায়ে প্রয়োজন নারীর অংশগ্রহণ ২৪
হাছিনা আক্তার

বাংলা সাহিত্য ও বর্ষা ঋতু ২৬
জায়েদুল আলম

বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন ৩০
প্রত্যয় জসীম

বর্ষার ফুল ৩২
শামস্ নূর

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে হাইড্রোগ্রাফির ভূমিকা ৩৪
সুস্মিতা চৌধুরী

সুন্দরবন রক্ষায় করণীয় ৩৬
ফারিহা হোসেন

হেপাটাইটিস: সচেতনতায় বাঁচবে প্রাণ ৩৮
ফাতেমা আক্তার

সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয় ৪০
সুব্রত কুমার

চা শিল্পে বঙ্গবন্ধুর অবদান এবং জাতীয় চা পুরস্কার ৪২
ফায়েজা খানম

গল্প

মাটির গন্ধ ৪৩
রফিকুর রশীদ

কবিতাগুচ্ছ ৪৬-৪৭

ইমরুল ইউসুফ, মোহাম্মদ ইল্‌ইয়াছ, কামাল বারি
সপ্তিকা চক্রবর্তী, শাহীন খান, এম.আবু বকর সিদ্দিক
রবিউল ইসলাম, মিতা চক্রবর্তী

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪৮

প্রধানমন্ত্রী ৫০

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৫২

উন্নয়ন ৫৪

ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫৫

শিক্ষা ৫৬

নারী ৫৭

অর্থনীতি ৫৮

যোগাযোগ ও নিরাপদ সড়ক ৫৯

কৃষি ৬০

পরিবেশ ও জলবায়ু ৬১

সামাজিক নিরাপত্তা ৬২

চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি ৬২

ক্রীড়া ৬৩

শ্রদ্ধাঞ্জলি :

চলে গেলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী বুলবুল মহলানবীশ ৬৪

সচিত্র বাংলাদেশ পত্রিকা ওয়েবসাইট থেকে পিডিএফ পড়তে QR কোডটি স্ক্যান করুন:

ফেসবুক লিংক:
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ দেখুন
www.dfp.gov.bd
E-mail: dfpsb1@gmail.com, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : এস.আর. প্রিন্টিং প্রেস লিঃ
৮৫/১ নয়াপল্টন, ঢাকা

হাইলাইটস

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২১ সালের পহেলা জুলাই ৩টি অনুষদ, ১২টি বিভাগ, ৬০ জন শিক্ষক ও ৮৪৭ জন শিক্ষার্থী নিয়ে যাত্রা শুরু করে। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। এ প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে ইতিহাসের নানা অধ্যায়। এ বিশ্ববিদ্যালয় জাতির সংকটে সত্যিকারের আলোর দিশারি, সেই ধারা এখনও প্রবহমান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মানেই বাঙালি জাতির এক গৌরবময় ইতিহাস। শিক্ষা, ঐতিহ্য, সংগ্রাম আর সাফল্যগাথার এই বিশ্ববিদ্যালয় ১০২ বছর পেরিয়ে ১০৩তম বর্ষে পদার্পণ করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই আবির্ভূত হয়েছেন দেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, গবেষক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং সামাজিক আন্দোলনের বলিষ্ঠ সব কণ্ঠস্বর। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বেই রোপিত হয়েছে জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের বীজ; যা বিশ্বায়নের এ যুগে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ঈর্ষণীয় সাফল্য।

বাংলার নানা ধরনের কর্মক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মের সৃজনশীলতা ও নেতৃত্ব সৃষ্টিতেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অনস্বীকার্য। এ বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মুক্তবুদ্ধির অবাধ চর্চার ক্ষেত্রেও এক নবদিগন্তের সূচনা করে। এ বিশ্ববিদ্যালয়কে অভিহিত করা হয় বুদ্ধিবৃত্তিক ও পরিশীলিত বিদ্যাচর্চার সূতিকাগার হিসেবে। এ বছরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর প্রতিপাদ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে 'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিশ্ববিদ্যালয়'– যা বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় অত্যন্ত গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত 'রূপকল্প-২০৪১' বা 'স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১' লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই উপজীব্য নির্বাচন নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। এই স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এবং গর্বিত অংশীদার হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর ঘোষণায় স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আশাব্যঞ্জক ইঙ্গিত বহন করে। আমাদের প্রত্যাশা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। 'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন পৃষ্ঠা-১৮

বাজেট বাস্তবায়নে চাই সতর্ক নীতিকৌশল

ড. আতিউর রহমান

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য যে প্রস্তাবিত বাজেট জুন মাসের শুরুতে আমরা পেয়েছিলাম তা সামান্য রদবদল করে জাতীয় সংসদ পাস করেছে। এখন তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এটা মানতেই হবে যে, বিদ্যমান ভূ-রাজনৈতিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এই বাজেট প্রস্তাবের আয়, ব্যয় ও ঘাটতি অর্থায়ন সবগুলো দিকেই অন্তত কিছু কিছু প্রস্তাবনা নিয়ে আরও ভাবনার সুযোগ ছিল। সেসবের কিছু কিছু পরিবর্তন আনাও হয়েছে। কোনো অবস্থাতেই এই বাজেটকে উচ্চাভিলাষী বলা যাবে না। ভবিষ্যৎমুখী এই বাজেটে বেশকিছু প্রাসঙ্গিক প্রস্তাবনাও রয়েছে। ফলে এই বাজেটকে সময়োপযোগীও বলা চলে। সত্যি বলতে, বাজেট তো নিছক অ্যাকাউন্টিং নয়। বরং একটি মনস্তাত্ত্বিক দলিল হিসেবে বিপৎসংকুল সময়ে জনমনে আস্থা তৈরিই বাজেটের মূল লক্ষ্য। সে বিচারে এ বাজেটের মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা এবং সর্বোপরি সামষ্টিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা থেকে নিম্ন আয়ের মানুষকে সুরক্ষা দিতে যে পরিকল্পনাগুলো নেওয়া হয়েছে এগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে এ সদ্য পাস হওয়া বাজেট জনমনে বেশ খানিকটা ভরসা সঞ্চার করতে সচেষ্ট হয়েছে এমনটি বলাই যায়।

তবে বাজেট কতটা আশাবাদী কিংবা উচ্চাভিলাষী সেটি মুখ্য প্রশ্ন নয়। আমাদের বরং ভাবা চাই এই বাজেট বাস্তবায়নের পথে চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে। কেননা আমরা এখন একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। গত দুই দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো সামষ্টিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ এই সময়ে মোকাবিলা করছি আমরা। কাজেই এ সময়ে বাজেট বরাদ্দ ও বাস্তবায়নে গতানুগতিকতা থেকে বেরিয়ে আসার কোনো বিকল্প নেই। এ প্রসঙ্গে সরকারের রাজস্ব আয়ের পরিকল্পনাটির দিকে প্রথমে নজর দেওয়া যাক। বেশ কয়েক বছর ধরেই আমরা বলে আসছিলাম যে, আমাদের কর-জিডিপির অনুপাত খুবই কম (১০ শতাংশের আশপাশে আটকে আছে), যা আমাদের প্রবৃদ্ধির বলশালী ধারার সঙ্গে মোটেও সংগতিপূর্ণ নয়। সর্বশেষ আইএমএফের তরফ থেকেও জিডিপির সঙ্গে সংগতি রেখে রাজস্ব আয় বাড়ানোর ইতিবাচক তাগিদটি লক্ষণীয়। এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান অর্থবছরের জন্য সরকার বাজেট বরাদ্দ যতটুকু বাড়িয়েছে, সে তুলনায় রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়েছে বেশি (বাজেট বেড়েছে ১৫.৩৩ শতাংশ, রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা বেড়েছে ১৫.৪৭ শতাংশ)।

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ১লা জুন ২০২৩ জাতীয় সংসদে তাঁর অফিসকক্ষে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অর্থবিলে স্বাক্ষর করেন– পিআইডি

রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বলা যায়, সরকার একটি 'কোয়ান্টাম জাম্প' করার ইঙ্গিত দিয়েছে বাজেটে। এমনটিই কাম্য। কিন্তু এজন্য যে বৈপ্লবিক সংস্কার দরকার হবে সেটি করতে পারা বা না-পারার ওপরই এই বাজেটের সাফল্য নির্ভর করছে। বিভিন্ন সময়ে সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের যে গতি আমরা দেখেছি এবার তার চেয়ে ভালো না করলে চলবে না। তবে এই লক্ষ্য বাস্তবায়ন কিন্তু অসম্ভবও নয়। লক্ষ্য অর্জনের সম্ভাব্য কৌশল ও সাফল্যের সাম্প্রতিক দৃষ্টান্তও

কিন্তু আমাদের সামনে আছে। যথাযথ ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণে নাটকীয় সাফল্য অর্জন খুবই সম্ভব। ডিজিটাল কর ব্যবস্থাপনা ছাড়া কর-জিডিপি হার বাড়ানো খুবই চ্যালেঞ্জিং হবে। অথচ এ দেশের প্রায় চার কোটির মতো করযোগ্য নাগরিক থাকা সত্ত্বেও মাত্র তিরিশ লাখের মতো মানুষ প্রত্যক্ষ কর প্রদান করেন। এনবিআর আমাদের জাতীয় পরিচয়পত্রের ডাটাবেজের সঙ্গে সংযুক্ত করে একটি অ্যাপ তৈরি করে সেই অ্যাপের মাধ্যমে এই কর প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারলে তা সব পক্ষের জন্যই সুফল বয়ে আনবে। ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে জটিল প্রক্রিয়া সহজীকরণের দৃষ্টান্তও কিন্তু আমাদের আছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নেতৃত্বে দেশের আর্থিক সেবা খাতের ডিজিটালাইজেশন যে সাফল্যের মুখ দেখেছে এবং আগামীতে 'ক্যাশলেস সোসাইটি' গড়তে যে মহাপরিকল্পনা নিয়ে তারা এগোচ্ছে সেখানে এনবিআরও অংশীদার হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, বলতে চাই ঘাটতি অর্থায়নের কথা। নতুন অর্থবছরে ঘাটতি বাজেট আড়াই লাখ কোটি টাকার বেশি, যা প্রক্ষেপিত জিডিপির ৫ শতাংশের বেশি। জিডিপির শতাংশ হিসাবে ঘাটতির এই অনুপাত সহনীয় বটে, কিন্তু বিশেষ সামষ্টিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখে থাকায় ঘাটতি অর্থায়ন ও তার ফলাফল নিয়ে আমাদের আরও একটু বেশি সজাগ থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, এই ঘাটতির ৫০ শতাংশের বেশি অর্থায়ন করা হবে অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে। এর বড়ো অংশই জোগান দেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ফলে একদিকে মূল্যস্ফীতি বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে, অন্যদিকে সরকার ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার ফলে ব্যক্তি খাতের জন্য ঋণ সরবরাহে চাপ পড়বে। মূল্যস্ফীতি সামাল দেওয়ার বিষয়টি একটু পরে তুলছি। আপাতত ব্যক্তি খাতের ঋণ সরবরাহে যে সম্ভাব্য চাপ আসতে যাচ্ছে তা মোকাবিলার বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করা যাক। সরকার ঋণ নেওয়ার পর ব্যক্তি খাতের জন্য যেটুকু ঋণ সরবরাহ থাকবে তা যদি এমন খাতে যায় যাতে তুলনামূলক কম দরকারি পণ্য বা সেবার আমদানি বাড়ে কিংবা তুলনামূলক কম কর্মসংস্থান হয় তাতে এই চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতি আরও চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠবে। অন্যদিকে ঋণ সরবরাহ যাতে উৎপাদনমুখী এবং কর্মসংস্থান বেশি হয়— এমন উদ্যোগ সংকট মোকাবিলায় সহায়ক হবে। বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে কৃষি এবং এমএসএমইগুলোকে। তবে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, উৎপাদনমুখী খাতে ঋণ সরবরাহ বাড়ানো কিন্তু কেবল বাজেট বা ফিসকাল পলিসি দিয়ে নিশ্চিত করা যাবে না, এ জন্য মুদ্রানীতি বা মনিটারি পলিসির নির্দেশনাও জরুরি। কাজেই ঘাটতি অর্থায়নের প্রভাব সামাল দিতে বাজেট ও মুদ্রানীতির মধ্যে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তরফ থেকে ইতোমধ্যে বাজেট ও মুদ্রানীতির ভারসাম্য নিশ্চিত করার আশ্বাস পাওয়া গেছে। জুন মাসের দ্বিতীয়ার্ধে যে মনিটারি পলিসি স্টেটমেন্ট দেওয়া হয়েছে সেখানে এই আশ্বাসের প্রতিফলন লক্ষ করা গেছে। এবারের মুদ্রানীতি মূল্যস্ফীতিকে এক নম্বর লক্ষ্য করে সুদের হারকে বাজারভিত্তিক করার চেষ্টা করেছে। পুরোপুরি না হলেও সুদের হারের উর্ধ্বসীমা তুলে দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেছে এই মুদ্রানীতিতে।

বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় বাজেট ও মুদ্রানীতির মধ্যকার সামঞ্জস্যটি আসলেই খুব তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন আমরা জানি, টাকার অবমূল্যায়নের কারণে ইতোমধ্যেই অনেক দরকারি পণ্যের আমদানি মূল্য বেশি পড়ছে। এ অবস্থায় এগুলোর ওপর আমদানি শুল্কে কিছুটা ছাড় দিতে পারলে তাতে মূল্যস্ফীতির চাপ কিছুটা হলেও সহনীয় হয়ে উঠবে বলে আমার মনে হয়। আমাদের আমদানি-রপ্তানির ব্যবধান তো কমাতেই হবে। তাই বলে ঢালাওভাবে সব ধরনের আমদানি কমানোর পথে হাঁটা যাবে না। তাতে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান পরিস্থিতি সংকটাপন্ন হতে পারে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে পুরো অর্থনীতিতেই। ফলে 'One size fits all' মানসিকতা পরিহার করে প্রত্যেকটি আমদানিকে আলাদাভাবে পর্যালোচনা করতে হবে। একই কথা ব্যক্তি খাতে ঋণপ্রবাহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সেজন্যই শুরুতে বলেছি এই বাজেটসহ সামনের দিনের পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের অবশ্যই খুব সজাগ থাকতে হবে। সংকটের বড়ো অংশ যেহেতু বহিঃঅর্থনীতিতে এবং যেহেতু বৈশ্বিক বাস্তবতায় আমাদের অতটা নিয়ন্ত্রণ নেই, তাই ক্রমপরিবর্তনশীল সামষ্টিক অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে আমাদের নীতি মনোযোগও পরিবর্তনশীল রাখতে হবে।

তৃতীয়ত, আলোকপাত করতে চাই বাজেটের ব্যয়ের প্রস্তাবগুলোর দিকে। আগেই বলেছি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ আমাদের প্রধানতম চ্যালেঞ্জ। বাজেটে মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশে ধরে রাখার যে লক্ষ্য রাখা হয়েছে তাকে স্বাগত জানাই। মুদ্রানীতিতেও এই লক্ষ্যমাত্রা পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এখনই তো মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশের

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালকে সাথে নিয়ে ১লা জুন ২০২৩ জাতীয় সংসদে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশনে যোগ দেন- পিআইডি

বেশি। বিশ্ববাজারে পণ্যের দাম কমছে ঠিকই। কিন্তু টাকার যে অবমূল্যায়ন ইতোমধ্যে হয়েছে তাতে মূল্যস্তর আগের অবস্থায় ফিরে আসার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। মুদ্রানীতিতে বাজারে টাকার সরবরাহ কিছুটা কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবুও এটা স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের বাড়ন্ত মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসতে বেশ খানিকটা সময় লেগে যাবে। এই সময়টায় নাগরিকদের বিশেষ করে নিম্ন আয় শ্রেণি এবং নিম্ন-মধ্য আয় শ্রেণির নাগরিকদের মূল্যস্ফীতির চাপ থেকে রক্ষা করার পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেওয়া চাই। এবারের বাজেটে ব্যয়ের প্রস্তাবগুলোর মধ্যে সামাজিক সুরক্ষার বরাদ্দগুলোর দিকে বিশেষ নজর দিতে চাই। প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক সুরক্ষায় বরাদ্দ চলতি বছরের সংশোধিতর চেয়ে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা বাড়িয়ে ১ লাখ ২৬ হাজার কোটি টাকার বেশি করা হয়েছে। তবে সামাজিক সুরক্ষার বরাদ্দ নিয়ে ভাবার সুযোগ রয়েছে। বিভিন্ন নগদ সহায়তা কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ হয়েছে ৪৩ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে ৬৩ শতাংশই চলে যাবে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশনে। এই পেনশন বাদ দিলে বাজেটে সামাজিক সুরক্ষার অংশ ১৭ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়ায় ১৩ শতাংশ। এবারের বাজেট প্রস্তাবে নতুন কোনো সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। বিদ্যমান বাস্তবতায় নগরাঞ্চলের কম আয়ের পরিবারগুলোর জন্য পাইলট ভিত্তিতে হলেও নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করা দরকার। ফলে বাজেটে সামাজিক সুরক্ষার অংশটি আরও বড়ো হতে পারত। একই কথা খাটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দগুলোর ক্ষেত্রেও। তবে আশার কথা যে, কৃষিতে সরকারের ভর্তুকি বা প্রণোদনা অব্যাহত রয়েছে। নতুন অর্থবছরে সর্বজনীন পেনশন কর্মসূচি চালু করার উদ্যোগটিও প্রশংসার দাবি রাখে।

আমরা লক্ষ করেছি যে, প্রতি অর্থবছরেই বিভিন্ন খাতে যা বরাদ্দ রাখা হয় প্রকৃতপক্ষে তার একটি বড়ো অংশ অব্যয়িত থেকে যায়। আমাদের প্রাথমিক হিসাব বলছে, এবারের বাজেটেরও অন্তত ১০ শতাংশ অব্যয়িত থেকে যেতে পারে। সাম্প্রতিক অর্থবছরগুলোতে বরাদ্দ ব্যয়ের ধারার পর্যালোচনা থেকেই এই সম্ভাব্য অব্যয়িত অংশের হিসাবটি করা হয়েছে। আমার মনে হয়, যেসব খাতে বড়ো টাকা অব্যয়িত থেকে যাওয়ার আশঙ্কা বেশি তাদের থেকে নিয়ে ওই বরাদ্দ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষায় দিলে মোট বাজেটের আকার না বাড়িয়েই দুর্যোগকালে নাগরিকদের সুরক্ষা আরও জোরদার করা সম্ভব হবে। সব খাতের উন্নয়ন প্রকল্প বাবদ বরাদ্দ বাস্তবায়নেরও একটি সার্বিক মূল্যায়ন হওয়া জরুরি। প্রধান অগ্রাধিকার প্রকল্প, বিশেষত যেগুলোর সঙ্গে সামষ্টিক অর্থনৈতিক সুরক্ষা বিশেষভাবে সম্পৃক্ত সেগুলোতে বরাদ্দ প্রবাহ বজায় রেখে তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যয় কাটছাঁট করার জন্য একটি সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ই এই উদ্যোগ নিতে পারে। তাদের নীতি-প্রস্তাবনা বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অবশ্যই সরকার নেবে। তবে প্রাথমিক বাছাই প্রক্রিয়াটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিকল্পনা কমিশন করতে পারে। আর এ কাজে তারা জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ প্রাজ্ঞজনদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান কাজে লাগাতে পারেন। সবশেষে বলতে চাই, এই সংকটকালীন সময়ের বাজেটটি অবশ্যই সংযত ও বিচক্ষণ হতে হবে। সম্প্রসারণমূলক প্রবৃদ্ধিমুখী হওয়ার কোনো সুযোগই ছিল না। তবুও এই অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.৫% হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। আমার মনে হয়, এ বছর প্রবৃদ্ধির হার কত হবে সে আলাপটি খুব প্রাসঙ্গিক নয়। এ বছরের বাজেট ও মুদ্রানীতির

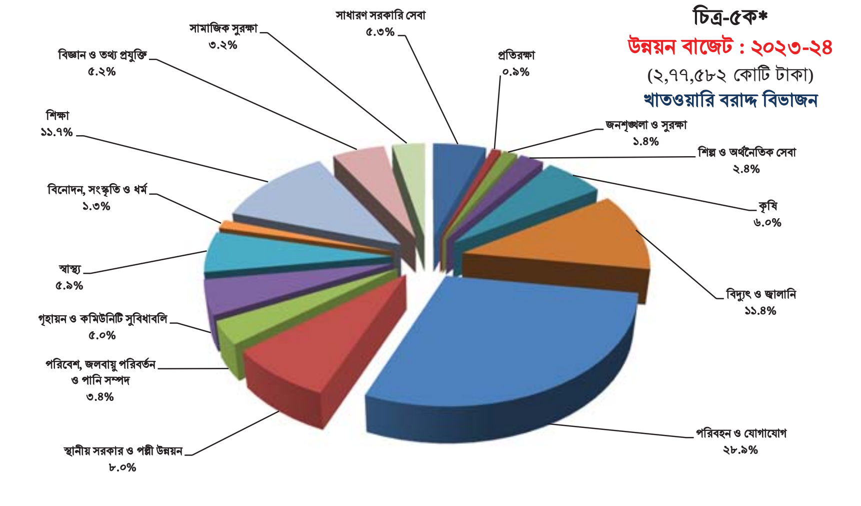

চিত্র-৫ক*

উন্নয়ন বাজেট : ২০২৩-২৪

(২,৭৭,৫৮২ কোটি টাকা)

খাতওয়ারি বরাদ্দ বিভাজন

* উন্নয়ন বাজেটে খাতওয়ারি বরাদ্দ বিভাজন নতুন প্রবর্তিত ১৫টি সেক্টরে পুনর্বিন্যাসপূর্বক প্রদর্শন করা হলো।

মূল লক্ষ্য যে সার্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সে কথাটি সকল অংশীজনকেই মানতে হবে। বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট এবং দেশীয় সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে কাঙ্ক্ষিত ঐ প্রবৃদ্ধির হার অর্জিত না হলেও আশাহত হবার কোনো কারণ নেই। তাই এই বাজেট বাস্তবায়নে চাই সতর্ক নীতিকৌশল।

ড. আতিউর রহমান: বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর

অর্থনৈতিক সংকট নিরসনে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ

মো. ফারুক আহমেদ

২০১৯ সালে কোভিড মহামারির আগমন এবং দেশে দেশে লকডাউন দেওয়ার শুরু থেকে অর্থনীতিবিদগণ একটা অর্থনৈতিক মন্দার আশঙ্কার কথা বলে আসছিলেন। বস্তুত তাই-ই ঘটেছে। ২০২০ থেকে বিশ্ব অর্থনীতি সংকুচিত হওয়া শুরু করে। উন্নত দেশসমূহ থেকে শুরু করে স্বল্পোন্নত দেশের প্রায় প্রতিটির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমে গেছে। কোভিডজনিত অর্থনৈতিক সংকটে ধনী দেশগুলোর তুলনায় স্বল্পোন্নত দেশগুলো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্যহীনতা, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাওয়া, জ্বালানির ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি স্বল্পোন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করে, যা প্রায় সব দেশের প্রবৃদ্ধিকে ক্রমাগতভাবে নিম্নমুখী অবস্থানে নিয়ে এসেছে। রাশিয়া এবং ইউক্রেন যুদ্ধ এই সংকটে আগুনে ঘি ঢেলে দিয়েছে। উল্লিখিত কারণের পাশাপাশি বিনিয়োগের হার কমে যাওয়া এবং যুদ্ধজনিত কারণে সাপ্লাই চেইন ভেঙে যাওয়ায় একের পর এক দেশ দেউলিয়ার দ্বারপ্রান্তে চলে এসেছে। ২০২৩-এর শুরুতে আইএমএফ কোভিড মহামারির প্রভাব এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধজনিত কারণে বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ দেশ মন্দার কবলে পড়বে মর্মে পূর্বাভাস দেয়। এর সপ্তাহ খানেকের মধ্যে বিশ্বব্যাংক 'গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেকটাস'-এ সতর্ক করে বলেছে যে, বিশ্ব একটি বড়ো অর্থনৈতিক মন্দার খুব কাছাকাছি চলে এসেছে এবং এটি ২০২৩ সাল থেকে শুরু হবে যার ফলে বিশ্বের প্রবৃদ্ধি ১.৭ শতাংশে নেমে যাবে। গেল বছরের মাঝামাঝি সময়ে সংস্থাটি ২০২৩ সালের প্রবৃদ্ধি ৩ শতাংশ হবে বলে প্রক্ষেপণ করেছিল। মন্দা শুরু হলে বিনিয়োগ হ্রাস পাওয়ায় উৎপাদনও হ্রাস পাবে, বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্যহীনতার কারণে দ্রুত রিজার্ভ কমতে থাকবে, জীবনদায়ী ঔষধ এবং খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী আমদানি করা দুষ্কর হবে, ফলে কোনো কোনো দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। নতুন করে করোনা ছড়িয়ে পড়লে এবং চলমান যুদ্ধ প্রলম্বিত হলে কিংবা ইউরোপ ও এশিয়ায় ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা বেড়ে গেলে বিশ্ব মন্দার তীব্রতা আরও বাড়তে পারে বলে বিশ্বব্যাংক আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। বিশ্বব্যাপী এ অর্থনৈতিক সংকট বিকাশমান ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে স্লথ করে দিবে বলে সকলে আশঙ্কায় আছে।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে উন্নত দেশসমূহের প্রবৃদ্ধির গতিধারাসহ বিকাশমান ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রবৃদ্ধির গতিপ্রকৃতির বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। ২০২৪ সালে উন্নয়নশীল দেশসমূহের জিডিপির পরিমাণ পূর্বের প্রক্ষেপণ অপেক্ষা ৬ শতাংশ কম হবে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিশ্ব মন্দার প্রভাব কেমন হবে? বিশ্বব্যাপী যে মন্দা দেখা দিবে তার কমবেশি কিছু আঁচড় আমাদের অর্থনীতির ওপর পড়বে এটা অস্বাভাবিক নয়। বিশ্বব্যাংকের মতে, মন্দার প্রভাবে ২০২৩ সালে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার হবে ৫.২%, ২০২৪ সালে তা ৬.২% হবে। তবে এটাও স্বীকৃত যে, বাংলাদেশ বিশ্ব সংস্থাসমূহের প্রক্ষেপণের তুলনায় সবসময় ভালো করেছে। এসব সংস্থাসমূহের প্রক্ষেপণকে ভুল প্রমাণিত করে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৭.২০% প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। ২০০৮-২০০৯ সালে সংঘটিত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশ বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। অর্থনীতিতে কোভিড-১৯-এর প্রভাবও যথেষ্ট দক্ষতার সাথে সামাল দিয়ে প্রবৃদ্ধির উচ্চ হার ধরে রেখেছে। জিডিপি-এর প্রবৃদ্ধির এই হার বিশ্বের সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশসমূহের মধ্যে একটি। এ অর্জন ও সফলতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োপযোগী ও সাহসী সিদ্ধান্ত এবং প্রজ্ঞাবান নেতৃত্বের ফসল। প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে কোভিড-এর অভিঘাত থেকে অর্থনীতিকে যখন সামলে নিয়ে অগ্রগতির ধারায় এগিয়ে যাচ্ছিল ঠিক তখনই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ সেই অগ্রগতির ধারাকে ব্যাহত করছে। একথা অনস্বীকার্য যে, যদি কোভিড মহামারি দ্বারা বিশ্ব আক্রান্ত না হতো এবং যুদ্ধ এসে বিশ্ব অর্থনীতিকে টালমাটাল না করত, তাহলে বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে প্রবৃদ্ধির হার ৮%-এর উপরে অর্জন করতে সক্ষম হতো।

মন্দা মোকাবিলায় সর্বাগ্রে একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে কী কী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন বাংলাদেশকে হতে হবে সেটা চিহ্নিত করতে হবে এবং সেগুলো থেকে পরিত্রাণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিশ্বব্যাংকের তরফে বলা হচ্ছে যে, উন্নয়নশীল এবং বিকাশমান দেশসমূহ তাদের অগ্রগতির ধারা ধরে রাখতে সক্ষম হবে না। অর্থনৈতিক সংকটের ফলে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান থাকবে না, যে কারণে উৎপাদন হ্রাস পাবে। কোভিড-এর শুরু থেকে এসব দেশে প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ায় এবং বিনিয়োগ সংকটের কারণে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো খাত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যা আসন্ন সংকটের কারণে আরও প্রকট হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এই বিশ্ব মন্দার ক্ষতিকর আশঙ্কা থেকে মুক্ত নয়, যদিও এখনও পর্যন্ত আমাদের অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি ধনাত্মক ধারায় প্রবহমান। জানুয়ারি ২০২৩-এ রপ্তানি আয় ও রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা রিজার্ভের পরিমাণ বৃদ্ধি করছে। এখানে উল্লেখ্য যে, সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপের কারণে আমাদেরকে রিজার্ভ সংকটের অভিঘাতে নিপতিত হতে হয়নি। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও অর্জিত সাফল্য নিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

সম্প্রতি ইউনিভার্সিটি অব অটোয়া, কানাডার সিনিয়র ফেলো সৈয়দ সাজ্জাদুর রহমান 'ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ অ্যান্ড মিডল ইনকাম কান্ট্রিজ' শীর্ষক এক গবেষণায় টেকসই উন্নয়নে বাংলাদেশের সামনে কয়েক ধরনের চ্যালেঞ্জের কথা তুলে ধরেছেন। এগুলোর মধ্যে অন্যতম– অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি

বাড়ানো, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো, জলবায়ু পরিবর্তন রোধ ও অভিযোজন ইত্যাদি। উল্লিখিত এই চ্যালেঞ্জগুলো বিশ্বব্যাংকের 'গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেকটাসে' বর্ণিত চ্যালেঞ্জের সাথে মিল দেখা যায়। বিশ্বব্যাংকের প্রক্ষেপণ অথবা গবেষণাপত্রে বর্ণিত চ্যালেঞ্জসমূহ সর্বাংশে বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এমন নয়। তবে আসন্ন মন্দা আমাদের অর্থনীতিকে ধাক্কা দিবে সেটা অনুমেয় এবং এটি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও ২০৩০-এর মধ্যে একটি উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়া এবং ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। উল্লিখিত প্রতিবেদন ও গবেষণাপত্রের এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। এসব সুপারিশসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো– বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, উৎপাদন বৃদ্ধি, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ এবং কূটনীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন, বেসরকারি খাতের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, ঋণ সহায়তার পরিবর্তে অংশীদারিত্ব এবং উন্নয়ন বিনিময়। ব্যবসায়ী সমাজ এবং অর্থনীতিবিদগণও নানারকম পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান করছেন। ব্যবসায়ী সমাজের পক্ষ থেকে এই সংকট মোকাবিলায় বেসরকারি বিনিয়োগ ও অংশীদারিত্বের দিকে গুরুত্ব প্রদানের জন্য সরকারের সহায়তা চেয়েছেন।

বিশ্ব অর্থনীতির এই সংকটকালে সরকারের পক্ষ থেকে নানারূপ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ ও অংশীদারিত্বের বিষয়টি উঠে এসেছে। অর্থাৎ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, সরকারের একক বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টার মাধ্যমে চলমান অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলা একটি অসম্ভব চিন্তা। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব এবং বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা হলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ নানাবিধ অর্থনৈতিক সূচকে দেশকে দ্রুত এগিয়ে নেওয়া সম্ভব।

ডলারের মূল্য বৃদ্ধির কারণে রিজার্ভের ওপর একটি বড়ো চাপ সৃষ্টি হয়েছে যা রপ্তানি বৃদ্ধি ও রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি করে মোকাবিলার চেষ্টা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে আইএমএফ থেকে ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে। এফডিআই বৃদ্ধি করেও ডলার প্রবাহ বাড়ানো যায়। এফডিআই বাড়ানোর ক্ষেত্রে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) একটি বড়ো ভূমিকা পালন করতে পারে। বড়ো বড়ো বিনিয়োগ প্রকল্পে বিদেশি বিনিয়োগ দ্রুত রিজার্ভ বৃদ্ধির সহায়ক। পিপিপি পাইপলাইনে বেশ কিছু প্রকল্প চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। এসব প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন হলে দেশে ডলার প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। ভৌত অবকাঠামোসহ বেশ কিছু বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতায় ধনাত্মক প্রকল্প রয়েছে যেগুলো পিপিপি-তে বাস্তবায়ন করা হলে সরকারের বাজেট কিংবা উন্নয়ন সহযোগীদের ঋণ সহায়তার বাইরে বাস্তবায়ন করা সম্ভব, যা দেশের জন্য মঙ্গলজনক।

পিপিপি কর্তৃপক্ষের ২য় বোর্ড সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক প্রকল্পগুলো পিপিপি-তে বাস্তবায়নের জন্য অনুশাসন দিয়েছিলেন। বিটিএমসি থেকে ইতোমধ্যে দুটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পর্যটন খাতে পিপিপির ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এ খাতে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করা গেলে দেশের এ খাতটি অর্থনীতিতে ভালো ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ লোকসানের ঘানি টানছে। এগুলোর একটা অংশ পিপিপি-তে পুনঃচালু করা গেলে উৎপাদন, কর্মসংস্থান এমনকি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সহায়ক হতে পারে। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ইউনিটের বেশ কিছু অব্যবহৃত জমি পড়ে আছে। এসব জমি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের পিপিপির আওতায় শিল্পকারখানা গড়ে তুলার জন্য দেওয়া যেতে পারে। আমাদের দেশে ব্যবহৃত কৃষি যন্ত্রপাতির বড়ো অংশ বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন কোনো সংস্থার অব্যবহৃত জমিতে কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরির শিল্প গড়ে তোলা গেলে দেশের প্রয়োজন মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হবে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অব্যবহৃত জমিতে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মাধ্যমে পিপিপির আওতায় ব্যবহার করা যেতে পারে। এভাবে অন্যান্য সংস্থার লোকসানি প্রতিষ্ঠান ও অব্যবহৃত জমি ব্যবহারের আওতায় নিয়ে আসা যায়, এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার বাস্তবায়ন করা সম্ভব। সংকটের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতি ইঞ্চি জায়গা ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়ানোর নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে সরকার এবং বেসরকারি খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ আছে যা আমাদের দেশে বিনিয়োগ হতে পারে। আমাদের বৈদেশিক মিশন এবং বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থাসমূহ এগুলো এক্সপ্লোর করতে পারে। দেশে দ্রুত বিনিয়োগ নিয়ে আসার জন্য পিপিপি-তে নীতিমালা ও বিধি রয়েছে, এ দুটি ব্যবহার করে অল্প সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এগুলো–

১. Policy for Implementing PPP Projects through Government to Government (G2G) Partnership, 2017 (Amended)

২. জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প বিধিমালা ২০১৮

এ দুটির আওতায় সরাসরি দেশি-বিদেশি অংশীদার নির্বাচন করা যায় বিধায় অংশীদারি চুক্তি কম সময়ে সম্পাদন করা সম্ভব। বর্তমান সময়ে এ দুটির ব্যবহার করা যেতে পারে।

অর্থনৈতিক সংকট উত্তরণে বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ বৃদ্ধি, বিনিয়োগ ও উৎপাদন, রপ্তানি এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য এ সময়ে পিপিপি পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছাড়া টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও ২০৩০-এর মধ্যে একটি উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়া এবং ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্য বাস্তবায়নে পিপিপি-কে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

মো. ফারুক আহমেদ: CPP, অতিরিক্ত সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

দুর্নীতিকে না বলুন

রুখবো দুর্নীতি, গড়বো দেশ
হবে সোনার বাংলাদেশ

বাজেট আলোচনা: অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষুদ্র একক

মোস্তফা মোরশেদ

রক্তাক্ত দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে জন্ম নেওয়া বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ফসল সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের বয়স অর্ধশতকের বেশি। রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে অর্থনৈতিক মুক্তি ও মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন অপরিহার্য। স্বাধীনতাকে প্রকৃত রূপ দিতে ২০০৮ সালে বর্তমান সরকার তার নির্বাচনি ইশতেহারে জাতির ইতিহাসে প্রথম একটি লিখিত স্বপ্ন উপহার দেয়। রূপকল্প-২০২১-এর আলোকে মধ্যম আয়ের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের সে স্বপ্নের চিত্রায়ণ আমাদের অর্থনীতির পথচলায় সত্যিকার অর্থে এক মাইলফলক। উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের পথ ধরে আমরা রূপকল্প-২০৪১ বিনির্মাণ করতে চাই। সে প্রেক্ষাপটে ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সফল রূপায়ণের জন্য রয়েছে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। বর্তমানে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চলমান রয়েছে। এসব পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক ক্ষুদ্র একক হলো বাজেট, যা প্রতি অর্থবছরে প্রণয়ন করা হয়। তাই বাজেট কেবলমাত্র কিছু সংখ্যা নয়; বরং একটি জাতির এগিয়ে চলার দর্শন। ভিন্নভাবে বললে, জনগণের স্বপ্নের বহিঃপ্রকাশ। কার্যত বাজেটের সহজপাঠ বলতে কিছু নাই; বরং সামষ্টিক অর্থনীতির বিভিন্ন চলকের যে নিবিড় ও কার্যকর সম্পর্ক রয়েছে সেগুলো বিবেচনায় নিয়ে বাজেট প্রণয়ন একটি দুরূহ কাজ। তবে আশার বিষয় এই যে, বাজেটের আকার, রাজস্ব আহরণ, সরকারি পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয় ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে পাঠকগণ সম্যক অবগত। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জন্য বাজেটের আকার ৭ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে ৭৯ হাজার ৬১৪ কোটি টাকার তুলনায় সাড়ে নয় গুণের বেশি।

বিশ্বব্যাংকের মাপকাঠিতে বাংলাদেশ ২০১৫ সালের জুলাই মাসে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। একইসাথে জাতিসংঘের বিবেচনায় ২০১৮ সালের মার্চ মাসে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার সকল শর্তও পূরণ করেছে। এ ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ ঘটবে। অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসহ সামাজিক চলকসমূহে পার্শ্ববর্তী ও সমজাতীয় দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশের ঈর্ষণীয় সাফল্য বিশ্ববাসীর নজর কেড়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নের সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালে এসডিজি প্রগ্রেস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। বিগত ১৪ বছরে আমাদের সাফল্যের পালকে যোগ হয়েছে অনেক কিছু। এ সময়ে দেশে জিডিপির গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.৭ শতাংশের বেশি। ইউরোপের Think Tank, Spectator Index অনুযায়ী, কোভিড-পূর্ববর্তী ১০ বছরে (২০০৯ থেকে ২০১৯) বাংলাদেশ ১৮৮ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে সারা বিশ্বে ১ম স্থানে অবস্থান করেছে। কোভিডকালীন বিশ্বের প্রায় সকল দেশে যখন ঋণাত্মক জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে তখন বাংলাদেশ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৩.৪৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে অর্থাৎ কোভিডের-পরবর্তী বছরেই উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরে আসে। ২০২০-২০২১ ও ২০২১-২০২২ অর্থবছরে যথাক্রমে ৬.৯৪ ও ৭.১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। জিডিপির আকার অনুযায়ী ২০০৮-২০০৯ সময়ে বাংলাদেশ ছিল বিশ্বের ৬০তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। ১৪ বছরের ব্যবধানে দেশ আজ বিশ্বের ৩৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান Centre for Economics and Business Research-এর ডিসেম্বর ২০২২ মাসের প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০৩৭ সালে বিশ্বের ২০তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে। মাথাপিছু আয় ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরের ৬৮৬ মার্কিন ডলার থেকে চারগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২ হাজার ৭৯৩ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। বেকারত্বের হার ২০১০ সালের ৪.৫ শতাংশ থেকে ২০২২ সালে ৩.২ শতাংশে নেমে এসেছে এবং কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের হার ২০১৬ সালের ৩৬.০ শতাংশ থেকে ২০২২ সালে ৪২.৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ২০০৯ সালের ৪ হাজার ৯০০ মেগাওয়াট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ সালে ২৭ হাজার ৩৬১ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। রূপকল্প-২০২১-এর প্রত্যয় অনুযায়ী কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্যঘাটতি দূর করা হয়েছে এবং দেশ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। জেন্ডার সংবেদনশীল নীতিকৌশল গ্রহণ ও তার কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে World Economic Forum-Gi Gender Gap Index প্রতিবেদনে ২০২২ সালে ১৪৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৭১তম অবস্থানে উঠে এসেছে। সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। আর এভাবেই সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব- নিকাশে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। রাজস্ব আয়ের চেয়ে রাজস্ব ব্যয় যথারীতি কম হলেও উন্নয়ন ব্যয়ের কারণে বাজেটে ঘাটতি হয়। এ সমীকরণে ঘাটতি দূর করার উপায় দুইটি, (১) রাজস্ব আহরণ বাড়ানো, অথবা (২) উন্নয়ন বাজেটে ব্যয় কমানো। রাজস্ব ব্যয় দীর্ঘ সময় ধরে প্রায় একই থাকে বলে পরিবর্তনের সুযোগ অনেক কম। অন্যদিকে, উন্নয়ন ব্যয় দীর্ঘমেয়াদে একটি দেশের এগিয়ে চলার মূল চালনাশক্তি। সে প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন ব্যয় কমিয়ে ঘাটতি কমানোর যথেষ্ট যুক্তি নেই। তাই রাজস্ব আহরণ ব্যতীত ঘাটতি মোকাবিলার যথেষ্ট সুযোগ নেই। তবে উন্নয়ন বাজেটকে অধিক দক্ষ ও কার্যকর করার মাধ্যমে সার্বিকভাবে বাজেট প্রণয়নে দক্ষতা অর্জন করা যেতে পারে। ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের যে কৌশল রয়েছে তা প্রতিপালন করার মাধ্যমে সরকারি উন্নয়ন বাজেট অধিকতর কার্যকর হতে পারে। আর সে কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারি উন্নয়ন ব্যয়ের ক্ষেত্রে নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু, ইন্টারনাল রেইট অব রিটার্ন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয়।

ঘাটতি বাজেট মানেই খারাপ- এ ধারণা অমূলক। একজন বিনিয়োগকারী যদি ৫ টাকা সুদে ১০০ টাকা ঋণ করে বছর শেষে ১০৬ টাকা আয় করেন তবেই ঋণ নেওয়া যৌক্তিক। ঠিক এ যুক্তিতেই সরকার যে সুদ হারে ঋণ নিবে তার চেয়ে যদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বেশি হয়, তবে ঋণ নেওয়া যেতেই পারে। এ কারণেই বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে কম সুদে ঋণ নিতে সরকার স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। মাথায় রাখতে হবে, রাজস্ব ব্যয় থেকে ঋণ পরিশোধ করতে হয়। এ ঘাটতি কত হতে পারে এটা পুরোপুরি নির্ভর করছে একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির ওপর। সাফল্যের জায়গা হচ্ছে, বাজেট ঘাটতির পরিমাণ দীর্ঘ সময় ধরে জিডিপির কমবেশি ৫ শতাংশের মতো। করোনা অতিমারির পর থেকে এ ঘাটতি সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। করোনাভাইরাসের অতিমারির সময় সরকার ব্যয় বাড়িয়ে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে চেয়েছে এবং সফল হয়েছে। এ সকল কৌশল বাস্তবায়নের জন্য ২ লক্ষ ৩৭ হাজার

৬৭৯ কোটি টাকার ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজ হাতে নেওয়া হয়, যা জরুরি স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্যনিরাপত্তা, কর্মসংস্থান বজায় রাখা ও অর্থনৈতিক ক্ষতি কমিয়ে আনার মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৫ লাখ কোটি টাকা। এর মধ্যে এনবিআর-এর অধীনে রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্য ধরা হয়েছে ৪ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা, এনবিআর-বহির্ভূত কর ব্যবস্থা থেকে ৭০ হাজার কোটি টাকা। রাজস্ব আদায়ের কাজটি বরাবরের মতোই কঠিন। এবার আমাদের উন্নয়ন বাজেটের মূল খাত এডিপিতে ২ লাখ ৬৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। প্রবৃদ্ধি তথা উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ ও বৈষম্য দূর করে স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাজেটে ঘাটতি হওয়া প্রাসঙ্গিক। প্রস্তাবিত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ হবে ২ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা, যা জিডিপির ৫.২ শতাংশ। এখানে উল্লেখ্য, এ হার গত বাজেটে ছিল ৫.৫ শতাংশ। বাজেট ঘাটতি মেটানোর মূল উৎস দুটি; অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক। প্রস্তাবিত বাজেটে মোট ঘাটতির মধ্যে ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩৯৫ কোটি টাকা অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে এবং ১ লক্ষ ২ হাজার ৪৯০ কোটি টাকা বৈদেশিক উৎস থেকে নির্বাহ করা হবে।

দীর্ঘমেয়াদে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ বাড়াতে বাজেটে ঘাটতি হওয়া স্বাভাবিক। এ বিনিয়োগের ফলে একইসঙ্গে যেমন বেকারত্ব কমবে, তেমনি অর্থনৈতিক সক্ষমতা তৈরি হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বাজেটে ঘাটতি হতেই পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, সময়ের সাথে সাথে যদি অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি গৃহীত ঋণের হারের চেয়ে বেশি হয়, তবে সে ঋণ অর্থনীতির জন্য মোটেও খারাপ নয়। যে-কোনো দেশের আয়ের জন্য একটি সহনীয় মাত্রার ঘাটতি বাজেট দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে তুলবে।

বাজেটে ঘাটতি হবার মূল কারণ রাজস্ব আহরণে ঘাটতি। উন্নয়নশীল সব দেশেই এ অবস্থা বিরাজমান। বাজেট ঘাটতি কম রাখার সবচেয়ে বড়ো কৌশল হলো রাজস্ব আয় বৃদ্ধি। সরকারের রাজস্ব আয় দুইভাবে আসতে পারে; কর ও কর-বহির্ভূত উৎস থেকে। করের দুটি উৎস: ক) প্রত্যক্ষ কর ও খ) পরোক্ষ কর। প্রত্যক্ষ করের মধ্যে রয়েছে ব্যক্তি পর্যায়ের আয়কর, কর্পোরেট কর, ব্যাংকের অতিরিক্ত লভ্যাংশ, সম্পদের উপর কর, ট্র্যাভেল ট্যাঙ ইত্যাদি। পরোক্ষ করের আওতা বেশ বড়ো যেখানে মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় ও আমদানি পর্যায়ে), সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় ও আমদানি পর্যায়ে), আমদানি শুল্ক, রপ্তানি শুল্ক ইত্যাদি রয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির চ্যালেঞ্জসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো কর-জিডিপি অনুপাত অনেক কম। আমাদের জন্য এ অনুপাত ৯ শতাংশের মতো, যা পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের চেয়ে কম। সাম্প্রতিক সময়ে কর-জিডিপি অনুপাত ভারতে ১৯ শতাংশ, কম্বোডিয়ায় ২৪ শতাংশ, লাওসে ১৫ শতাংশ, মালয়েশিয়ায় ২০ শতাংশ, নেপালে ২২ শতাংশ, থাইল্যান্ডে ১৮.৫ শতাংশ। এর মধ্যে আমাদের পরোক্ষ করের ওপর নির্ভরশীলতা বেশি। মোট রাজস্ব আয়ের প্রায় ৬৬ শতাংশ আসে পরোক্ষ কর থেকে এবং পরোক্ষ করের একটি বড়ো অংশ আসে ভ্যাট থেকে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল-আইএমএফও রাজস্ব আদায় ব্যবস্থাপনা সংস্কারের পরামর্শ দিয়েছে। প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে নতুন করদাতাদের শনাক্ত করে কর আদায়, মূল্য সংযোজন কর আদায়ে আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে রাজস্ব আয় বাড়ানো যেতে পারে।

বাজেটের অগ্রাধিকার তালিকার শুরুতেই রয়েছে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য রক্ষা। বোধকরি, এ নিয়ে কেউ দ্বিমত করবেন না। বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি, রশিয়া-ইউক্রেন সংকট এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের ব্যাঘাত ঘটার কারণে সাম্প্রতিক সময়ে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। সাম্প্রতিক ডলারের বিপরীতে মুদ্রার মানের অবনতি হয়েছে, যা কার্যত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তবে কৌশলগত দিক থেকে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার যে পদক্ষেপ তা প্রশংসার দাবি রাখে।

দুটি ভিন্ন মাপকাঠিতে বাজেটের সার্বিক সফলতা নিরূপণ করা যায়; বাজেট প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়ন। বাজেট প্রণয়নের সবচেয়ে কঠিন দিক হলো প্রবৃদ্ধিকে সকল আয়ের মানুষের জন্য ছড়িয়ে দেওয়া; অন্যভাবে বললে, সম্পদের সুষম বণ্টন। অগ্রাধিকার তালিকায় সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি সেদিকে ইঙ্গিত করে। মূল্যস্ফীতির কারণে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ায় নিম্ন-আয়ের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রয়াসে সরকার বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী খাতের বরাদ্দ বিগত অর্থবছরের তুলনায় ১১ শতাংশ বাড়িয়েছে, যা জিডিপির ২.৫২ শতাংশ। বাজেট বাস্তবায়ন বরাবরের মতোই চ্যালেঞ্জিং। বাজেট বাস্তবায়নে সরকারি ব্যয়ের গুণগত মান বাড়াতে হবে। বিশেষ করে, যারা বাস্তবায়নের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত তাদের অনেক বেশি দায়িত্বশীল হতে হবে। এলডিসি থেকে উত্তরণ, কোভিড-উত্তর পুনরুজ্জীবন বাস্তবায়ন করা, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রতিকূল পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয় বাজেটের সামনে রয়েছে, যা সম্মিলিতভাবে মোকাবিলা করতে হবে।

১লা জুন ২০২৩-এ সংসদে উত্থাপিত অর্থবিল সংসদ সদস্যদের অনুমোদনের পর আইনে পরিণত হবে এবং তা ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য কার্যকর হবে। ইতোমধ্যে আমাদের জিডিপির আকার ৪৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে; বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে বিশ্বের ৩৫তম বৃহত্তম অর্থনীতিতে। প্রাক্কলন করা হয়েছে যে, ২০৪১ সালের পূর্বেই বিশ্বের শীর্ষ ২০ অর্থনীতির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে বাংলাদেশ। এগারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত 'উন্নয়নের দীর্ঘ অগ্রযাত্রা পেরিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশের অভিমুখে' শীর্ষক ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেট হোক আমাদের রূপকল্প–২০৪১-এর কার্যকর ভিত্তি। জাতীয় বাজেট বক্তৃতা ২০২৩-২০২৪-এর বর্ণনা অনুসারে, 'স্মার্ট বাংলাদেশে' মাথাপিছু আয় হবে কমপক্ষে ১২ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলার; দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকবে ৩ শতাংশের কম মানুষ আর চরম দারিদ্র্য নেমে আসবে শূন্যের কোঠায়; মূল্যস্ফীতি সীমিত থাকবে ৪-৫ শতাংশের মধ্যে; বাজেট ঘাটতি থাকবে জিডিপির ৫ শতাংশের নীচে; রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত হবে ২০ শতাংশের উপরে; বিনিয়োগ হবে জিডিপির ৪০ শতাংশ। শতভাগ ডিজিটাল অর্থনীতি আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক স্বাক্ষরতা অর্জিত হবে। সকলের দোড়গোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে যাবে। স্বয়ংক্রিয় যোগাযোগ ব্যবস্থা, টেকসই নগরায়নসহ নাগরিকদের প্রয়োজনীয় সকল সেবা থাকবে হাতের নাগালে। তৈরি হবে পেপারলেস ও ক্যাশলেস সোসাইটি। সবচেয়ে বড়ো কথা, স্মার্ট বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হবে সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। বাজেট ২০২৩-২০২৪ বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার ও স্মার্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের পথে আরও একধাপ এগিয়ে যাব বলেই আমাদের বিশ্বাস।

মোস্তফা মোরশেদ: উপসচিব, অর্থ বিভাগ ও উন্নয়ন অর্থনীতি গবেষক, murshed.info@gmail.com

বাঘ আমাদের জাতীয় পশু

প্রফেসর ড. আ ন ম আমিনুর রহমান

চার বছর আগের ঘটনা। সকালের হালকা রোদের আলোয় কটকা টাওয়ারের প্রায় পঞ্চাশ গজ সামনে একটি ঝুনঝুনি বা বন অতসীগাছে সুন্দরী বায়স নামের মহাবিপন্ন এক প্রজাপতির ছবি তুলছিলাম। ছবি তুলতে তুলতে উড়ন্ত পতঙ্গটির পিছু পিছু আমরা কজন বনের এতটাই গহীনে চলে গেলাম যে সুন্দরবনের সম্রাটের কথা মাথায়ই এলো না। প্রজাপতিটির প্রজনন ক্ষেত্র আর আমাদের জাতীয় পশু সুন্দরবনের সম্রাট রয়েল বেঙ্গল টাইগার বা বাংলা বাঘের বাড়ি যে একই জায়গায় তা ছবি তোলায় মশগুল আমরা কজন খেয়ালই করিনি। অথচ এর আগে যতবার কটকা এসেছি, সব সময় স্থানটি এড়িয়ে চলেছি। সে কারণেই দেশের সবচেয়ে বিরল ও মহাবিপন্ন সুন্দরী বায়স বা সুন্দরবন ক্রো প্রজাপতির প্রজনন ক্ষেত্রটি কখনও দেখিনি। বিশ্বের আর কোথাও এই প্রজাপতিটিকে দেখা যায় না।

সেদিন সুন্দরবনের সম্রাটের বাড়িতে যা দেখলাম তাতে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। ঝুনঝুনি বাগানে মহাবিপন্ন পতঙ্গটির মেলা বসেছে যেন! মহা আনন্দে যখন ছবি তুলছিলাম, তখন আমাদের সুন্দরবন ভ্রমণের গাইড ফেমাস ট্যুর বিডির কর্ণধার তানজির হোসেন রুবেল কানের কাছে এসে ফিসফিসিয়ে বলল, এক ঝলকের জন্য সেও বন্যপ্রাণী আলোকচিত্রী নাজিম সুন্দরবনের সম্রাটকে হেঁটে যেতে দেখেছে। রক্ত হিম করা এ সংবাদে মুহূর্তেই প্রজাপতির প্রাকৃতিক বাগান মানবশূন্য হয়ে পড়ল। সবাই প্রাণ হাতে নিয়ে দ্রুত ঘাটে বাঁধা ইঞ্জিন নৌকার দিকে ছুটলাম কটকা অফিসের পাশে নোঙর করা ছোট্ট লঞ্চ 'এম বি গাংচিল'-এ ওঠার জন্য। সেদিন লঞ্চের প্রায় সকলেই বাঘ আতঙ্কে ছিলাম। এরপরও দুপুরে ভয়ে ভয়ে কটকা থেকে জামতলী সমুদ্রসৈকত পর্যন্ত একবার ঘুরে এসেছিলাম, তবে সম্রাটের কোনো হদিস পাইনি।

গত সাতাশ বছর ধরে নিয়মিত সুন্দরবন যাচ্ছি প্রকৃতি-পাখি-প্রজাপতি-বন্যপ্রাণী দেখতে ও ওদের ছবি তুলতে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির বিরল ও দুর্লভ পাখি-প্রাণীর প্রচুর ছবি তুলতে পারলেও পায়ের ছাপ ছাড়া বাঘ মামার কোনো ছবি তুলতে সক্ষম হইনি। বেশ কয়েকবার সম্রাটের বেশ কাছাকাছি থেকেও তাকে দেখতে ব্যর্থ হয়েছি, ছবি তোলা তো দূরের কথা। একবার বাঘের বৈঠকখানা খ্যাত কচিখালীতে এক বাঘিনীর গর্জন শুনেছিলাম। গত বছর বাঘের খোঁজে পাঁচদিন সুন্দরবন ঘুরে ব্যর্থ হয়ে ঘরে ফিরলাম। এর ঠিক একমাস পর আমাদের টিম সুন্দরবনের হোমরা বা সুন্দরী খালে গাছের ডালে বসা এক বাঘের দেখা পেল। প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় ধরে তারা ওর ছবি তুলল। কিন্তু দুর্ভাগ্য সেদিন আমি ওদের সঙ্গে ছিলাম না।

তবে, বার বার সুন্দরবন গিয়ে ছবি তুলতে ব্যর্থ হলেও ভারতের 'রণথামভোর জাতীয় উদ্যান' আমাকে হতাশ করেনি। ওখানে পরপর দুদিন দুটি আলাদা স্থানে গিয়ে দুটি ভিন্ন বাঘের দেখা পেয়েছি ও চমৎকার সব ছবি তুলেছি। সুন্দরবনে না দেখলেও রণথামভোরে বাঘ দেখে আমি তৃপ্ত এ কারণে যে, ওখানকার ও আমাদের সুন্দরবনের বাঘ জিনগতভাবে সবচেয়ে কাছাকাছি। বিশ্বের পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক সমন্বয়ে সম্পন্ন এক গবেষণার ফলাফলে জিনগতভাবে রণথামভোরের বাঘের সঙ্গেই সুন্দরবনের বাঘের সবচেয়ে বেশি মিল পাওয়া গেছে।

২৯শে জুলাই বিশ্ব বাঘ দিবস বা আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্র দিবস। বাঘ সংরক্ষণে বিশ্বব্যাপী জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রতিবছর দিনটি পালন করা হয়। রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে ২০১০ সালে অনুষ্ঠিত বাঘ সম্মেলনে এই দিবসটির সূচনা হয়। সে সম্মেলনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও

উপস্থিত ছিলেন। বিশ্বব্যাপী এই দিবস পালনের মুখ্য উদ্দেশ্য বাঘের প্রাকৃতিক আবাসভূমি রক্ষা ও বাঘ সংরক্ষণের জন্য মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে বাঘ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও ভীতি দূর করা। বাঘ বাংলাদেশের জাতীয় পশু হওয়ায় এই দিবসের গুরুত্ব অনেক বেশি।

আগে সারা দেশের বনজঙ্গলে বাঘ বাস করলেও পঞ্চাশের দশকের পর এদেরকে সুন্দরবন ছাড়া দেশের অন্য কোথাও দেখা যায়নি। সর্বশেষ ১৯৬২ সালে পঞ্চগড়ের বাংলাবান্ধায় শেষ গ্রামীণ বনের বাঘটি মারার পর এ দেশের গ্রামে আর কোনো বাঘ দেখার রেকর্ড নেই। বাংলাদেশে সর্বমোট কতগুলো বাঘ আছে এ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন সময় এ দেশের সুন্দরবনে বাঘ শুমারির মাধ্যমে ৩০০-৫০০টি বাঘের উপস্থিতি রেকর্ড করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৫ সালে ক্যামেরা ট্র্যাপভিত্তিক বাঘ শুমারিতে সুন্দরবনে ১০৬টি বাঘের অস্তিত্ব ধরা পড়ে, যা ২০১৮ সালের শুমারিতে ৮% বেড়ে ১১৪টি হয়। এটিই এখন এ দেশের বাঘের সর্বমোট সংখ্যা। তবে আগের তুলনায় ইদানীং সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা বেড়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। কারণ, গত দুবছর ধরে প্রায়ই বাঘ সুন্দরবন ভ্রমণকারীদের নজরে আসছে। সূত্র মতে, বর্তমানে সুন্দরবনে বাঘের আরেকটি ক্যামেরাভিত্তিক শুমারি চলমান যার ফলাফল ২০২৪ সালের ২৯শে জুলাই জনসমক্ষে প্রকাশ করবে বাংলাদেশ বন বিভাগ। তবে আশার কথা, সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিভাগের মিয়ানমার সীমান্তবর্তী এলাকা, যেমন কাসালং রিজার্ভ ফরেস্ট ও সাঙ্গু-মাতামুহুরি অভয়ারণ্য এবং সিলেট বিভাগের ভারতীয় সীমান্তবর্তী পাথারিয়া হিল রিজার্ভ ফরেস্টে বাঘের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

বাঘ এ দেশে ব্যাঘ্র বা বাঘ মামা নামে পরিচিত। ইংরেজি নাম Tiger বা Bengal Tiger। সুন্দরনের বাঘকে Royal Bengal Tiger বলেই ডাকা হয়, যা ব্রিটিশদের দেওয়া। ফ্যালিডি গোত্রের সদস্য বাঘের বিজ্ঞানভিত্তিক নাম Panthera tigris। পৃথিবীতে বাঘের একটিই প্রজাতি। যদিও ইতঃপূর্বে বিজ্ঞানীরা বাঘকে ৮টি (তিনটি বিলুপ্তসহ) উপপ্রজাতিতে বিভক্ত করেছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি দুটি উপপ্রজাতিতে পুনঃশ্রেণিভুক্ত করেছেন, যেমন মহাদেশীয় (Continental-Panthera tigris tigris) ও সুন্দা (Sunda-Panthera tigris sondaica) বাঘ। মহাদেশীয় উপপ্রজাতিটিকে এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে পাওয়া যায়, যা বাংলা, মালয়ান, ইন্দোচীনা, আমুর, ক্যাস্পিয়ান (বিলুপ্ত) এবং দক্ষিণ চীনা (কার্যকরীভাবে বিলুপ্ত) বাঘের জনসংখ্যা নিয়ে গঠিত। অন্যদিকে, সুন্দা উপপ্রজাতিটিকে (যা এক সময় ইন্দোনেশিয়ার সুন্দা দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন অংশে পাওয়া যেত) শুধু সুমাত্রায় পাওয়া যায় এবং জাভা ও বালিতে বসবাসকারীগুলো বর্তমানে বিলুপ্ত।

সুন্দরবনের বাঘকে ঘিরে রয়েছে নানা গল্প, কিংবদন্তি বা মিথ (Myth)। বনের বাওয়ালি (অর্থাৎ কাঠুরে), মৌয়াল (বা মধু সংগ্রহকারী), জেলে ও আশপাশের এলাকার লোকদের ধারণা বাঘের নাম মুখে নিলে তাকে অপমান করা হয়; এতে তাদের অমঙ্গল হবে। তাই বিভিন্ন বিশ্বাস মতে এর বিভিন্ন নাম রয়েছে। বড়ো মামা, বড়ো শিয়াল, বনরাজা, বড়োকর্তা, বড়ো সাহেব, গাজী ঠাকুর, বড়ো পাইক– এ সবই বাঘের এক একটি নাম।

রয়েল বেঙ্গল টাইগার বা বেঙ্গল টাইগার বিড়াল পরিবারের প্রাণী। বিজ্ঞানীদের মতে, বাংলা বাঘ ভারতীয় উপমহাদেশে প্রায় ১২,০০০ বছর আগে আবির্ভূত হয়। বাঘের পূর্বপুরুষের নাম খড়গ-দাঁতি বা তলোয়ার-দাঁতি বাঘ (Saber-toothed tiger)। এদের উপরের চোয়ালের ছেদন দাঁত দুটো দেখতে তলোয়ারের মতো ছিল, যা দিয়ে সহজেই শিকারকে বিদ্ধ করা যেত। তারপর অনেক বছর গড়িয়ে গেছে। উপরের চোয়ালের ছেদন দাঁত ছোটো হয়ে বর্তমান আকারে এসেছে। উৎপত্তি হয়েছে বর্তমানকালের বাঘ প্রজাতির। এরপর উৎপত্তি হয়েছে বাঘের দুটি উপপ্রজাতি ও জনসংখ্যাগুলো; অবশ্য ইতোমধ্যে কোনো কোনোটি হারিয়েও গেছে। কিন্তু এতকিছুর পরেও বাঘের শিকার ঘায়েল করার ক্ষমতা কিন্তু কমেনি এতটুকুও। তবে কোনো কারণে বাঘ এই দাঁত হারালে আর স্বাভাবিক নিয়মে শিকার করতে পারে না। জীবনরক্ষার জন্য তাকে বেছে নিতে হয় ভিন্ন পথ।

বাঘ সবচেয়ে বড়ো বিড়ালজাতীয় প্রাণী। লেজ বাদে দেহের দৈর্ঘ্য ১৪০-২৮০ সেন্টিমিটার, লেজ ৬০-১১০ সেন্টিমিটার ও উচ্চতা ৯৫-১১০ সেন্টিমিটার। বাংলাদেশের জাতীয় পশুর দেহের লোম সোনালি বা কমলা ও তাতে চওড়া কালো ডোরা থাকে। দেহতলের মূল রং সাদা। লম্বা লেজটিতে থাকে কালো ডোরা। পুরুষের মাথার দুপাশে থাকে লম্বা লোম। চোখ অত্যন্ত উজ্জ্বল। বিশাল আকারের মাথাটা গোলাকার। ১৮০-২৮০ কেজি ওজনের বাঘ মামা অত্যন্ত শক্তিশালী। নিজের থেকে দু'তিনগুণ বেশি ওজনের পশু শিকার করে অনায়াসেই টেনে নিয়ে যেতে পারে।

সুন্দরবনের সম্রাট বাঘ নির্জন অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকা আর নিঃসঙ্গতা পছন্দ করে। তাছাড়া সে চলেও একা। দক্ষ সাঁতারুও বটে। মল-মূত্রের মাধ্যমে নিজের বিচরণ এলাকা চিহ্নিত করে। এই গন্ধ পেলে অন্য কোনো বাঘ সেখানে যায় না। তাছাড়া তার নির্দিষ্ট এলাকায় অন্য কোনো বাঘকে সে বরদাস্তও করে না। মূত্র ছাড়াও বাঘ গাছের বাকল আঁচড়েও নিজের সীমানা নির্ধারণ করতে পারে। বাদাবন, চিরসবুজ ও কনিফার বন, শুষ্ক কণ্টকময় বন, উঁচু ঘাসবন ইত্যাদি এলাকায় বাঘ বাস করে। দিনে কাঁটায় ভরা হেতাল গাছের আড়ালে শুয়ে থাকে। নদী বা খালের পাড়ে জন্মানো অত্যন্ত ঘন গোলপাতার বনও মামার প্রিয় জায়গা। বাঘ যেমন হিংস্র তেমনি বুদ্ধিমানও বটে। সাধারণত ভোরবেলা ও সন্ধ্যায় শিকারে বের হয়; কখনও কখনও রাতে। মামা শিকারও করে একা, আর ভোজও সাড়ে একা।

চিত্রা হরিণ, বুনো শুয়োর, বানর, সজারু, গিরগিটি, বড়ো পাখি ইত্যাদি প্রিয় খাবার। তবে খাদ্যের অভাবে মাছ, কাঁকড়া ইত্যাদিও খায়। তবে এরা কিন্তু জন্মসূত্রে মানুষখেকো হয় না। বরং মানুষকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে শক্তি কমে এলে, কোনো কারণে আহত হলে (সজারুর কাঁটায় আহত হওয়াটা সচরাচর দেখা যায়), ছেদন দাঁত বা কুকুর দাঁত ভেঙে গেলে, জেলে-বাওয়ালি, বাজ-ঈগল-বানরের অত্যাচারে, মৌমাছির হুলের জ্বালায় এদের মাথা ঠিক থাকে না। আর তখনই মানুষকে আক্রমণ করে। অনেক সময় বনের চরে কবর দেওয়া মৃত জেলে-বাওয়ালির মাংস খেয়েও মানুষের নোনা মাংসের স্বাদ পায়, যা আর কোনোদিন ভুলতে পারে না। ফলে পরিণত হয় মানুষখেকোতে। সন্তানহারা বাঘিনীও রাগে-দুঃখে, প্রতিহিংসায় মানুষখেকো হতে পারে। আবার মানুষখেকো বাঘিনীর শিকার করা নরমাংস খেয়ে বাচ্চারাও যে নোনা স্বাদ পায় তার ফলে বড়ো হয়ে মানুষখেকোতে পরিণত হতে পারে।

মামা কখনোই পিছু হটতে জানে না। একবার কোনো শিকারকে তাক করলে ঝাঁপিয়ে পড়বেই। তবে ব্যর্থতার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা থাকলে সেই শিকার ধরা থেকে বিরত থাকে। আবার নতুন করে

রনথামভোরের রয়েল বেঙ্গল টাইগারের রাজকীয় চাহনি। ছবি- লেখক

পজিশন নেয়। শিকারের জন্য দেড়-দুই কিলোমিটার চওড়া নদীও পার হতে পারে। মামা কোনো শিকারকেই সামনের দিক থেকে ধরে না। পেছন থেকে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়াই তার স্বভাব। তাছাড়া বাতাসের বিপরীত দিক থেকে আক্রমণ করে বলে শিকার বাঘের গন্ধ টের পায় না। দেহ বিশাল হলেও শিকার ধরার মুহূর্তে তা কুঞ্চিত করে ছোটো করে ফেলে। মাটিতে কয়েকবার লেজ দিয়ে আঘাত করে। পায়ের থাবায় লুকানো নখ বের করে আনে। লেজ পাকিয়ে খাড়া করে নেয়। পায়ের তলায় নরম মাংসপিণ্ড থাকায় শিকারের একবারে আগ মুহূর্তেও কোনো শব্দ হয় না। এরপর হঠাৎ করেই বিশাল এক হুংকার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারের উপর। শিকার ধরে তাতে দাঁত বসিয়ে টেনে শ'খানেক মিটার দূরে নিয়ে যায়। সেখানেই ভুড়িভোজ সারে। ভোজশেষে পেটপুরে পানি পান করে। তারপর দেয় লম্বা ঘুম। ভোজ একবারে শেষ করতে না পারলে তা মাটি, পাতা দিয়ে লুকিয়ে রাখে ও অন্য সময় খায়। একবারে প্রায় ২৫-৩০ কেজি মাংস খেতে পারে। সুন্দরবনের সৌন্দর্য রয়েল বেঙ্গলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে গাজীর নাম। সুন্দরবনের এই কৃতি সন্তান প্রায় ষাটটি বাঘ শিকার করেছেন, যার বেশির ভাগই ছিল মানুষখেকো।

বাঘ বছরের যে-কোনো সময়ই প্রজনন করতে পারে। এ সময় মামার গগনবিদারি বা আকাশ কাঁপানো হুংকার শোনা যায়। সে হুংকারে কেঁপে ওঠে বনজঙ্গল, খাল-নদী আর বনের পশুপাখি। বাঘিনী ১০৪-১০৬ দিন গর্ভধারণের পর ৩-৫টি অন্ধ বাচ্চার জন্ম দেয়। এ সময় সে অত্যন্ত নিরিবিলি জায়গায় আশ্রয় নেয়। আমাদের মধ্যে একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, পুরুষ বাঘ বাচ্চাদের খেয়ে ফেলে, তাই বাঘের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বাঘিনী সতর্কতার সাথে বাচ্চাদের রক্ষা করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি ঠিক নয়। কারণ পুরুষ বাঘ কখনোই তার ঔরশজাত বাচ্চাকে খায় না, বরং রক্ষা করে। তবে সে অন্য বাঘের বাচ্চা খায়। আর এ কারণেই জন্মানোর পর অর্ধেক বাচ্চাও বড়ো হতে পারে না। বাচ্চাহারা বাঘিনী অত্যন্ত হিংস্র ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়। জন্মের প্রায় দশ দিন পর বাচ্চাদের চোখ ফোটে। এরা প্রায় আট সপ্তাহ মায়ের দুধ পান করে। এরপর মায়ের শিকার করা খাবারে মুখ লাগায়। ধীরে ধীরে মায়ের কাছ থেকে শিকার করা শেখে। বাঘিনী এক-দেড় বছর বাচ্চাদের চোখে চোখে রাখে। আর আড়াই-তিন বছর বয়সে যখন দ্বিতীয়বার এদের দাঁত গজায় তখন থেকেই এরা পুরোপুরি স্বাধীন। আর মায়ের সঙ্গে থাকে না। পুরুষ বাচ্চা ৪-৫ ও স্ত্রী ৩-৪ বছরে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। এরা দু'তিন বছরে একবার মাত্র প্রজনন করে। বাঘ ১৫-২০ বছর বাঁচে।

সূত্র মতে, বর্তমানে এ দেশের বাঘ রক্ষার জন্য বেশকিছু প্রকল্প চলমান রয়েছে, যা এ দেশের গৌরব সুন্দরবনের সম্রাট 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' রক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশাবাদী।

প্রফেসর ড. আ ন ম আমিনুর রহমান: বন্যপ্রাণী জীববিজ্ঞানী, প্রাণিচিকিৎসক ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্যপ্রাণী প্রজনন ও সংরক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যাপক, aminoor69@yahoo.com

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা হোক

নৈতিকতা ও সততা
জীবনে আনে পবিত্রতা

রঙের বাড়ুই হুমায়ূন আহমেদ

পরীক্ষিৎ চৌধুরী

তিনি কোনো আর্কিটাইপের ধার ধারেননি। না সাহিত্যে, না চলচ্চিত্রে। প্রোটাগনিস্ট বা এন্টাগনিস্ট কিংবা গতানুগতিক প্রেম দেখানোর বহুল ব্যবহৃত যে ছাঁচ আমরা সচরাচর দেখে থাকি, সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে গেছেন বার বার। নিজেই নিজের ছাঁচ তৈরি করে চমকে দিলেন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে। চুম্বকের মতো টেনে নিলেন, হাতির ছবিঅলা আঠার মতো আটকে রাখলেন উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। তাঁর লেখা টিভি নাটক দেখার সময় দর্শক ভুলেই গেল 'রিমোট কন্ট্রোল' বলে একটা ডিভাইস আছে, যা দিয়ে চ্যানেল পরিবর্তন করা যায়। অনেকদিন পর পরিবার নিয়ে হলে গিয়ে সিনেমা দেখার উৎসবে মাতল জনসংখ্যার বড়ো একটি অংশ মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠী। বিনের মুখের সামনে সাপের মতোই আমরা হেলেছি-দুলেছি তাঁর লেখা পড়ে, তাঁর চলচ্চিত্রিক সৃষ্টি দেখতে দেখতে।

একজন সাধারণ পাঠক বা দর্শক কতটুকুইবা ধরতে পারবেন এই সব্যসাচীকে! হ্যাঁ, সব্যসাচী হুমায়ূন আহমেদ (১৩ই নভেম্বর ১৯৪৮-১৯শে জুলাই ২০১২) তো এক হাতে গল্প-উপন্যাস-নাটক লিখেছেন, আরেক হাতে দর্শক নন্দিত চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন।

সম্প্রতি প্রয়াত ওপার বাংলার কথাসাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারও হুমায়ূনকে ধরতে হুমায়ূনেরই স্মরণাপন্ন হয়েছিলেন। হুমায়ূন আমাকে বলত, 'সমরেশ দা, যে বাঙালি ১৬ বছর বয়সে পা দিয়েও হুমায়ূন পড়েনি, সে পাঠকই না। আর যে ২৪-এর পর হুমায়ূন পড়ে, সে নির্বোধ। পাঠক নয়।' আমাকে হুমায়ূন এই কথা বলার পর আমি সেটা লিখেও ছিলাম। হুমায়ূন নিজেই বলত, 'আমার পাঠকের বয়স ১৬ থেকে ২৪ বছর।' ও এটা খুব বিনয় নিয়ে বলত। একজন লেখকের ভেতর অসাধারণ কিছু না থাকলে এক বইমেলায় একেকটা বইয়ের ৩০-৩৫ হাজার কপি বিক্রি হয় না। ও নিজের সম্পর্কে নিজের মূল্যায়ন খুব ভালোভাবেই করতে পারত।

কথাটা খেয়াল করুন তো আরেকবার, 'ও নিজের সম্পর্কে নিজের মূল্যায়ন খুব ভালোভাবেই করতে পারত'। তার অর্থ দাঁড়ায়, হুমায়ূন আহমেদ সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে সমরেশ স্বয়ং সংকোচে হাত গুটিয়েছিলেন। আর আমি এই ক্ষুদ্র হুমায়ূন ভক্ত কোন ছার!

তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করতে যাওয়া রীতিমতো দুঃসাহসের কাজ। শুধু লেখালেখি নয়, সাহিত্য সৃষ্টির মেলায় চূড়ান্ত জনপ্রিয়তা পাওয়ার পর তিনি যখন নাটক লেখা শুরু করলেন এবং আরও পরে চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্রতী হলেন তখন আর ১৬ থেকে ২৪ বছরের কিশোর-তরুণরা শুধু নয়, ছোটো থেকে বড়ো সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো গোগ্রাসে গিলতে থাকলেন তাঁর নাটক, তাঁর চলচ্চিত্র।

এমন সব্যসাচীকে স্মরণ করে দু'চার পৃষ্ঠার জন্য কলম ধরা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। হুমায়ূন আহমেদ গল্প-উপন্যাস মিলিয়ে তিন শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। মঞ্চ ও টেলিভিশনের জন্য লিখেছেন প্রায় ১৫০টি নাটক। চলচ্চিত্র করেছেন ৮টি। এই মহাসমুদ্রসমান কর্মপরিধির মধ্যে এই নিবন্ধের ব্যাপ্তি থাকবে মূলত তাঁর চলচ্চিত্র সৃজন নিয়ে। তাও আলতো করে ছুঁয়ে যাওয়া মাত্র।

হুমায়ূনের পাঠক এবং দর্শক হিসেবে সবসময় তাঁর কাজের প্রতি যে টান অনুভব করি তার এক পিঠে আছে পরমানন্দের বিচ্ছুরণ, অপর পিঠে রয়েছে আশ্চর্য বিষাদ। তাঁর বইয়ের পাতায় পাতায়, সেলুলয়েডের দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে লজিক এবং ম্যাজিকের সমান্তরাল পথ চলায় মানুষ নিজেকে সবসময় যেন হারিয়ে ফেলে। তাঁর শিল্পসিদ্ধির কারুকার্যময় রস-রহস্যজগতে যে-কেউ একবার প্রবেশ করলে মুগ্ধ ও বিহ্বল হবেনই। উপন্যাস, নাটক, চলচ্চিত্র নির্মাণ, গান রচনা– যেখানেই হাত দিয়েছেন, সেখানেই তিনি তাঁর মহাপরাক্রমশালী সম্মোহনী শক্তি দেখিয়েছেন অবলীলায়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সাহিত্যের জগতে তাঁর আবির্ভাবের আগে আমাদের দেশের পাঠকরা মজেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের মধ্যে। তাঁদের ঘরানার ভাষা ছিল সংস্কৃত শাসিত; বাক্যগঠন, চলন-বলনের মধ্যে একটা বাড়তি কেতাবি ওজন। সাহিত্যের সেই সংস্কার ও প্রথার বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত তারুণ্যের মনের মাঝে বিক্ষোভ দানা বেঁধেছিল, এটা বোধহয় হুমায়ূন টের পেয়েছিলেন। পুরানো ঘরানায় আঘাত করলেন তিনি। প্রথম উপন্যাস *নন্দিত নরকে* দিয়েই সৃষ্টি করলেন নতুন ভাষার জগৎ। ছোটো ছোটো বাক্যের স্বচ্ছন্দ, ঝরঝরে, গতিময়, প্রাণবন্ত নাগরিক গদ্য ভাষা।

চলচ্চিত্রেও সেই স্বাচ্ছন্দ্য, সেই তরতর করে এগিয়ে চলার গতি তিনি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন মুনশিয়ানার সঙ্গে। নদীর মতো নিস্তরঙ্গ গতিতে প্রবাহিত হয়– চলচ্চিত্রের এমন একটা ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন বলে তাঁর সিনেমাগুলো দেখতে গিয়ে থমকে যেতে হয় না।

২

হুমায়ূন আহমেদ চলচ্চিত্র নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছিলেন নব্বইয়ের দশকের প্রারম্ভে। পরবর্তীতে প্রায় দুই দশক ধরে আটটি সিনেমা নির্মাণ করেছিলেন। শুধু 'পরিচালনা' শব্দটি ব্যবহার করলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে বলে ইচ্ছে করেই এখানে 'নির্মাণ' শব্দটি ব্যবহার করেছি। কাহিনি, চিত্রনাট্য, সংলাপ, গান রচনা, সুর সংযোজন, পরিচালনা– কোনো ক্ষেত্রই তাঁর অগম্য কিংবা অনধিকারে ছিল না। এসব গুণপনার কারণে তিনি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নিজের একটি পাকাপোক্ত আসন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন নিজস্ব ঘরানা।

সিনেমা বানাবেন– এ রকম কোনো স্বপ্ন তাঁর ছিল না। তাঁর মাথায় সিনেমা বানানোর পোকা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন বন্ধুস্থানীয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বড়ো ভাই আনিস সাবেত। তবে সিনেমা দেখার নেশা তাঁর পুরোদস্তুর ছিল।

লেখালেখির সুবাদেই হুমায়ূন আহমেদকে আমরা চলচ্চিত্রে পাই ১৯৯২ সালে। পরিচালক মুস্তাফিজুর রহমান হুমায়ূনের *শঙ্খনীল কারাগার* উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ন করেন। চলচ্চিত্রটি জাতীয়

চলচ্চিত্র পুরস্কারে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রসহ চারটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার অর্জন করে। চলচ্চিত্র নির্মাণের আগেই শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারটি তাঁর ঘরে পৌঁছে যায়।

পরবর্তীতে হুমায়ূন আহমেদ নিজে আটটি চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছেন। এছাড়া তাঁর উপন্যাস ও গল্পকে কেন্দ্র করে তৌকির আহমেদ নির্মাণ করেন *দারুচিনি দ্বীপ*। মোরশেদুল ইসলাম তাঁর দুটো গল্পের চলচ্চিত্রায়ণ করেন, একটি শিশুতোষ চলচ্চিত্র *দূরত্ব* এবং অন্যটি ডিজিটাল চলচ্চিত্র *প্রিয়তমেষু*। আবু সাইয়ীদ নির্মাণ করেন *নিরন্তর*, বেলাল আহমেদ নির্মাণ করেন *নন্দিত নরকে* এবং শাহ আলম কিরণ নির্মাণ করেন *সাজঘর*। সুভাষ দত্ত হুমায়ূন আহমেদের কাহিনি ও চিত্রনাট্যে *আবদার* নির্মাণ করেন।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র যখন ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে বিশাল এক জনগোষ্ঠীর মনস্তত্ত্বকে ধরতে ব্যর্থ হচ্ছিল, ঠিক তখনই এই শিল্পে হুমায়ূনের আবির্ভাব। *আগুনের পরশমণি* (১৯৯০) এবং *শ্রাবণ মেঘের দিন* (১৯৯৯) চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সিনেমা হল-বিমুখ দর্শককে ফিরিয়ে আনেন সিনেমা হলে। প্রমাণ করে দেন ভালো ছবিও চলে।

চলচ্চিত্র নির্মাণের শুরু থেকেই নাগরিক মধ্যবিত্ত ও তারুণ্যের আবেগ-আকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে হুমায়ূন আহমেদ জীবনের গূঢ় রহস্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। স্বপ্ন দেখানোর এক অবিশ্বাস্য ক্ষমতা ছিল তাঁর গল্পজুড়ে। তাঁর গল্প-উপন্যাসের মতোই দর্শক আপন আয়নায় নিজেদের ছবি ও যাপিত জীবনের চালচিত্র দেখে বিস্মিত হয়। জাদুকরী চৌম্বকশক্তিই তাঁকে দ্রুত খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে যায়। কাহিনি বর্ণনায় টানটান উত্তেজনা, কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার বিন্যাস, চমকপ্রদ নাটকীয়তা, বৈচিত্র্যময় ও বিশ্বাসযোগ্য চরিত্র সৃষ্টি এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি তাঁকে নিয়ে যায় দর্শকপ্রিয়তার শীর্ষে। কবি শামসুর রাহমান তাঁর সাহিত্য নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, 'হুমায়ূন আহমেদ আমাদের সস্তা চতুর্থ শ্রেণির লেখকদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন।' সে সুরেই বলতে হয়, হুমায়ূন আহমেদ আমাদের চতুর্থ শ্রেণির সস্তা সিনেমার হাত থেকে সাময়িক স্বস্তি দিয়েছিলেন।

তাঁর চলচ্চিত্রের আঙ্গিক-প্রকরণের নিরীক্ষাও কম নয়। নদীর মতোই ধরাবাধা পথে তিনি হাঁটেননি, তাঁর গতিপথেও বাঁক বদলও দেখা যায়। প্রথাবদ্ধ পথে চলার বাধ্যবাধকতা না থাকায় দর্শক নিজের কল্পনাকে অবাধে মেশানোর সুযোগ পান বলে যে আঙ্গিকেই তিনি একটি সিনেমা তৈরি করেন না কেন, আগাগোড়াই তা দ্যুতিময়।

৩

তাঁর চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তুতে দুটি প্রবণতা দেখা যায়। যার একদিকে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধকালীন জনজীবন; আরেকদিকে রয়েছে তাঁর পরিচিত স্বকীয়তা, ব্যক্তি মনস্তত্ত্ব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এখানেও রয়েছে সেই লজিক ও ম্যাজিকের সমান্তরাল খেলা।

সিনেমায় নেমে প্রথমেই মুক্তিযুদ্ধকে উপজীব্য করলেন হুমায়ূন আহমেদ। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পিতার শহিদ হওয়ার ব্যক্তিগত বেদনার পাশাপাশি পারিবারিক ও তখনকার সামাজিক সংকটের মিশেলে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর ছিল বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা। *জ্যোৎস্না ও জননীর গল্প* উপন্যাসের উপজীব্য সেই অভিজ্ঞতা।

চলচ্চিত্রেও সেই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। প্রথমেই নির্মাণ করেন *আগুনের পরশমণি*। ঢাকা শহরের নাগরিক প্রতিবেশে যুদ্ধকালীন জনজীবনের সংকট, মধ্যবিত্তের দুরবস্থা, মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণ থেকে শুরু করে রুচিস্নিগ্ধ অব্যক্ত প্রণয় এই সিনেমায় দেখা গেছে।

শ্রাবণ মেঘের দিন-এও তিনি মুক্তিযুদ্ধের কথা বলেছেন, তবে ভিন্ন আঙ্গিকে। শাহানার দাদু ইরতাজুদ্দিন মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি মিলিটারিদের আশ্রয় দিয়ে যে অপরাধ করেছিলেন তার জন্য শাহানা দাদুকে গ্রামবাসীর কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করে। ইরতাজুদ্দিনের এই ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি সে সময় ছিল খুব প্রাসঙ্গিক, তখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল চারদিকে। কিন্তু যুদ্ধাপরাধীরা ঘুরে বেড়াচ্ছিল সদর্পে। তাই ইরতাজুদ্দিনকে গ্রামবাসীর সামনে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে একটি বার্তা দিয়েছেন হুমায়ূন। সবার মনে আছে নিশ্চয়, বাংলাদেশ টেলিভিশনে যখন 'রাজাকার' শব্দ উচ্চারণ করা যেত না তখন হুমায়ূন আহমেদ তাঁর 'বহুব্রীহি' নাটকে টিয়া পাখির মুখ দিয়ে উচ্চারণ করান 'রাজাকার'।

এই ছবিতে তিনি হাওর অঞ্চলের চিত্র তুলে ধরেছেন। আধুনিক জীবনযাত্রা ও সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত গ্রামের পশ্চাৎপদ মানুষের জীবনের সরল ও জটিল দিকের যুগপৎ উপস্থাপন এখানে বিদ্যমান। সামাজিক বৈষম্য ও শ্রেণি বিভেদের চিত্রও দেখা গেছে। গ্রামের পথ ধরে শাহানা যখন হাঁটে, তখন তার মনে হয়– এই গ্রামের মানুষগুলো এত দরিদ্র কেন? ঘরবাড়ির কী অবস্থা? আহারে, একটু কিছু যদি এই মানুষগুলোর জন্য করা যেত!

মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে হুমায়ূন আহমেদের সর্বশেষ চলচ্চিত্র *শ্যামল ছায়া* (২০০৪)। এখানে প্রাধান্য পেয়েছিল গ্রামজীবনে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব। প্রাণে বাঁচার তাগিদে একটি বহমান নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করে একদল মানুষ। নদীর বুকে তাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্তরে স্তরে মুক্তিযুদ্ধের খণ্ড চিত্র ও সংকট দেখিয়েছেন হুমায়ূন আহমেদ। নদীমাতৃক বাংলাদেশ, বাংলাদেশের সাহসী ও ভিতু মানুষ, এ দেশের মানুষের ধর্মীয় সংকট, সংশয় এবং সম্প্রীতির মতো বিষয়গুলো উঠে এসেছে *শ্যামল ছায়ায়*।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রগুলোতে তিনি এপিক বিস্তারে না গিয়ে ইতিহাসের ধূসর প্রান্তরে ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে এর গায়ে অন্য রকম আলো ফেলেছেন। এই আলোয় বেরিয়ে এসেছে যুদ্ধকালীন মানুষের অজানা অধ্যায়। যুদ্ধের দৃশ্যকল্প বর্ণনায় হত্যা, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, লুটপাটের চিত্র খুব নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে, যুদ্ধোত্তর বাস্তবতার জটিল-প্যাঁচ এবং দ্বন্দ্বগুলোকে কেউ সহজভাবে উপস্থাপন করতে পারেনি।

৪

হুমায়ূন আহমেদ গল্প-উপন্যাস-নাটকে প্রায় সময় যে ধরনের বাস্তবতা ও জাদুবাস্তবতার সম্মিলন ঘটান, তারই একটি প্রতিনিধি *দুই দুয়ারী* (২০০০)। একই নামে তিনি আগে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন, সেটি অবলম্বনে এই চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্র দিয়ে হুমায়ূন বলতে চেয়েছেন সবসময় সবকিছুর উত্তর থাকে না। জীবন ম্যাজিকাল। ক্রিস্টাল গেইলের সেই গানটির মতো, We must believe in magic. If you believe in magic, you have the universe at your command.

নিজের লেখা *চন্দ্রকথা* উপন্যাস অবলম্বনে ২০০৩ সালে হুমায়ূন আহমেদ নির্মাণ করেন *চন্দ্রকথা*। ট্র্যাজিক মহিমায় উদ্ভাসিত *চন্দ্রকথায়* গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান সরলতা ও সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি নিষ্ঠুরতাকেও তুলে এনেছেন তিনি। এখানে হুমায়ূন খুব সুনিপুণভাবে সহিংসতার দৃশ্য সরাসরি না দেখিয়ে মূল ঘটনাকে নান্দনিকতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন।

নয় নম্বর বিপদ সংকেত (২০০৭) চলচ্চিত্রের পোস্টারে লেখা ছিল– একটি অর্থহীন ছবি। এক সাক্ষাৎকারে হুমায়ূন আহমেদ বলেছিলেন, এটা এক ধরনের রসিকতা বলা যেতে পারে। আমি এটা যেহেতু হাসির ছবি বানিয়েছি, আমি মনে করেছি আমাদের যে সমস্ত অর্থপূর্ণ কর্মকাণ্ড আছে সেগুলোতে আনন্দ নাই। সে সমস্ত কাজেই আমরা আনন্দ পাই, যেগুলোতে অর্থ কম। সে হিসেবে একটি আনন্দময় কাজকে আমি একটি অর্থহীন ছবি বলেছি।

যুবক বয়সে লেখা উপন্যাস নিয়ে ২০০৮ সালে হুমায়ূন নির্মাণ করেন *আমার আছে জল*। এই চলচ্চিত্রে তাঁর অন্যান্যগুলোর বাইরে ভিন্ন এক দ্যোতনা দেখা যায়। এটি একটি রোমান্টিক ধারার চলচ্চিত্র। হুমায়ূন আহমেদের অন্যান্য চলচ্চিত্রের তুলনায় এটি বেশ আধুনিক ধাঁচের। এটি ব্যবসায়িকভাবে খুব একটা সফলতার মুখ দেখেনি, কারণ সমালোচকরা বলেন, এটি ছিল খুবই সাধারণ মানের।

ঘেটুপুত্র কমলা (২০১২) শুধু অসামান্য শিল্পই নয়, ইতিহাসের সত্য বয়ানও বটে। বাংলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা ভুলে যাওয়া ইতিহাসের উপাদানকে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সবাই তুলে আনতে পারে না। দেড়শো বছর আগে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গড়ে ওঠা সংস্কৃতির উপাদান ঘেঁটুগানকে নিয়ে সৃষ্টি করেছেন এই চলচ্চিত্র তাঁরই ছোটো গল্প একজন শৌখিনদার মানুষ থেকে।

৫

সাহিত্যকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরের একটা তাগিদ চলচ্চিত্র শিল্প শুরু হওয়ার দিন থেকেই দেখা যাচ্ছিল। সেই তাগিদের বাস্তবায়ন করেন প্রথম ডাবলু জি গ্রিফিত। ঔপন্যাসিক কনরাড ও গ্রিফিত দুজনেই সাহিত্য থেকে শিল্পসৃষ্টির অভিপ্রায়ের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, The task I am trying to achieve is to make you see.

সেই ধারাবাহিকতায় বাংলা ভাষায় প্রথম সাহিত্যভিত্তিক চলচ্চিত্রায়ণ হলো ১৯২২ সালে। তখনকার পূর্ববঙ্গের নরেশ মিত্র শিশির কুমার ভাদুড়ীর সাথে যৌথভাবে শরৎচন্দ্রের *আঁধারের আলো*' চলচ্চিত্র রূপ দিলেন। হুমায়ূন আহমেদের মধ্যেও তাঁর নিজের সাহিত্যকর্মের চলচ্চিত্রায়ণের তাড়না প্রবলভাবে কাজ করেছিল। চলচ্চিত্রের জন্য সাম্প্রতিক সময়ে গল্প-উপন্যাসের অভাব নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের আক্ষেপ ছিল এরকম, সাধারণত কী হচ্ছে, অর্ধেক সময়ে পরিচালক নিজেই স্ক্রিপ্টের কাজ করছেন। কিন্তু ভালো মৌলিক কাহিনির ভয়ানক অভাব। যে-কোনো পুজো সংখ্যা পড়ার চেষ্টা করলেই দেখা যাবে কোনো গল্পই শেষ করা যাচ্ছে না। সিনেমা তৈরির উপযোগী গল্পের সত্যিই অভাব রয়েছে। হুমায়ূন আহমেদের সবচেয়ে বড়ো সুবিধা এখানেই, নিজের গল্প-উপন্যাসের অন্ত নাই, সেগুলো নিয়েই কাজ করেছেন।

গল্প-উপন্যাসের মতোই হুমায়ূনের নাটক ও চলচ্চিত্রেও এক বড়ো স্থান দখল করে আছে হিউমার। হিউমার-ঋদ্ধ সংলাপ বিন্যাসে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বাংলাদেশের সাহিত্যে হিউমারের অভাব দেখে তাঁর মধ্যে হতাশা কাজ করছিল। তাঁর ভাষায়– 'হিউমার আমাদের সমাজে, আমাদের জীবনে এত বেশি। কিন্তু আমরা লেখার সময় করি কি- সেখানে হিউমার আপনা থেকেই বাদ পড়ে যায়। লেখাগুলো হয়ে যায় শুকনো, নিরস ...।' তাইতো জীবনের গুরুভারকে লঘু করে হাস্য-কৌতুক রসে খানিকটা ভারমুক্ত করে দেখবার অভিনব 'টেকনিক অব আর্ট' হিসেবে হিউমারের আশ্রয় নিয়েছিলেন। 'উইট' বা 'হিউমার'-এর প্রয়োগ-কুশলতায় সবাই পারঙ্গম হতে পারেন না। হুমায়ূন দারুণ মুনশিয়ানার সঙ্গে রসবোধের বিষয়টি তাঁর কলম ও সেলুলয়েডে যুক্ত করেছেন।

হুমায়ূন আহমেদ কোনো চরিত্রে ইচ্ছা করে হীনতা যেমন আরোপ করেননি, অনুরূপভাবে কোনো হীন চরিত্রের গায়েও অকারণ মহত্ত্বের আলগা প্রলেপ যুক্ত করেননি। ঠিক এই জায়গাতেই চরিত্র নির্মাণে তিনি হয়ে উঠেছিলেন স্বতন্ত্র।

তাঁর গল্প-উপন্যাস-নাটক-সিনেমার চরিত্রদের প্রায় সকলেই যেন পরিচিত মানুষ। পারিপার্শ্বিকতার অতি চেনা সাদামাটা মানুষ, কিছু খেয়ালি, কিছু প্রতীকী চরিত্রের সংকুলান ঘটান তিনি। আবার কেউ খ্যাপা, পাগলাটে। তাঁর চরিত্রগুলো সবাই যেন শিকল ভাঙার তৃপ্তির সন্ধানে নিয়োজিত। হুমায়ূন আহমেদ বার বার শিকল ভাঙার কথা বলেছেন তাঁর উপন্যাসে, তাঁর চলচ্চিত্রেও। তাঁর লেখনীতেও ধরা পড়ে প্রকটভাবে, 'শিকল দিয়ে কাউকে বেঁধে রাখা হয় না। তারপরেও সব মানুষ কোনো না কোনো সময় অনুভব করে তার হাতে-পায়ে কঠিন শিকল। শিকল ভাঙতে গিয়ে সংসার-বিরাগী গভীর রাতে গৃহত্যাগ করে। ভাবে, মুক্তি পাওয়া গেল। দশতলা বাড়ির ছাদ থেকে গৃহী মানুষ লাফিয়ে পড়ে ফুটপাতে। এরা ক্ষণিকের জন্য শিকল ভাঙার তৃপ্তি পায় (*দরজার ওপাশে*)।'

তাই তো অপ্রকাশিত ভালোবাসা কিংবা মতির উদাসীনতার কারণে কুসুমের জন্য বিষপান অনিবার্য হয়ে ওঠে। আবার কুসুমের নিথর দেহ দেখে মতি হাতের বৈঠা নদীতে ফেলে দেয়। ফিরে যাবার প্রয়োজনও ফুরিয়ে যায় তার কাছে। কোথায় ফিরবে? কার কাছে ফিরবে? আর কোনো শিকলে বাঁধা পড়তে চায় না যেন মতি। তাই সিনেমা শেষ হয় নদীতে বৈঠা ভাসতে ভাসতে। মতি গেয়ে উঠে শোয়া চান পাখি আমি ডাকিতেছি, তুমি ঘুমাইছো নাকি। যে পাখি শিকল কেটে উড়ে গেছে মহাশূন্যের দিকে।

সাহিত্যে যেমন পাঠক পেয়েছিল হিমু, মিসির আলি, শুভ্রকে; নাটক ও চলচ্চিত্রের কাহিনির বিস্তরণে দর্শক বাকের ভাই, মুক্তিযোদ্ধা বদিউল আলম, রাত্রি, মওলানা মুসলেমউদ্দিন, আশালতা, মতি, কুসুম, চন্দ্র, ঘেটুপুত্র কমলা, জয়তুনদের মধ্যে খুঁজে পায় প্রগাঢ় মানবিক মূল্যবোধ। সব চরিত্রের মধ্য দিয়ে একটি অন্তর্নিহিত জীবনদর্শন ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছিলেন– সকল অন্ধকারের মধ্যেও মানুষের শুভবোধের জয় হয়।

গান হুমায়ূন আহমেদের চলচ্চিত্রের চুম্বক-অনুষঙ্গ। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র জগতের সংগীতেও হুমায়ূন আহমেদের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার্য।

চলচ্চিত্রশিল্পের অনেক অধরা বোধকে ধরার জন্য সংগীত বড়ো হাতিয়ার। ভারতীয় উপমহাদেশের চলচ্চিত্রে সংগীত একটি বিশেষ জায়গা দখল করে আছে এবং এর বাণিজ্যিক প্রয়োগ বেশ লক্ষণীয়। ভারতীয় চলচ্চিত্রে প্রথম প্লেব্যাক প্রচলন করেন আরেক বাঙালি নীতিন বোস। ১৯৩৫ সালে *ভাগ্যচক্র* চলচ্চিত্রে প্রথম প্লেব্যাক ব্যবহার করে তিনি দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার অর্জন করেন।

বাঙালি গানপাগল। *চর্যাপদ* থেকে শুরু করে পাঁচালি, পুঁথি, মধ্যযুগীয় সাহিত্য, বিভিন্ন অঞ্চলের লোকগাথা, যাত্রা যেমন ছিল গাননির্ভর, তেমনি এই অঞ্চলের আচার-অনুষ্ঠান, পার্বণ, উৎসবের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের পেছনে গানের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। আমাদের লোকগানের ভাণ্ডার বেশ সমৃদ্ধ। হুমায়ূনের চলচ্চিত্রে এই লোকগানের প্লাবন দেখা যায়। লোকগানের মধ্যে থাকে প্রচ্ছন্ন দ্ব্যর্থবোধক ভাব। পরিচালক হুমায়ূন আহমেদ বহুমুখী বার্তা দেওয়ার জন্যই বোধহয় এ ধরনের গানগুলো ব্যবহার করেছেন। একটা ছিল সোনার কন্যা, আমার ভাঙা ঘরে ভাঙা চালা, বরষার প্রথম দিনে, ও আমার উড়াল পঙ্খীরে, শুয়াচান পাখি, চাঁদনী পসরে কে আমায় স্মরণ করে, চল বৃষ্টিতে ভিজি, যদি মন কাঁদে তুমি চলে এসো এক বরষায়, আমার

গায়ে যত দুঃখ সয়, পূবালী বাতাস, শুয়া উড়িল উড়িল, নিশা লাগিল রেসহ বেশ কিছু গান শ্রোতাদের ধ্রুপদী পছন্দ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। তিনি কেবল সংগীত রচনার মাধ্যমেই নিজের দায়িত্ব সমাপ্ত করেননি। আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন উকিল মুন্সির তুল্য সংগীত প্রতিভাকে। নতুন করে আবিষ্কার করেছেন– আব্দুল কুদ্দুস বয়াতী, বারী সিদ্দিকী, সেলিম চৌধুরীদের।

তাঁর চলচ্চিত্রে তেমনি লোকজীবন, লোকাচার, লোকজ খেলার প্রতিও তাঁর গভীর অনুরাগ এবং প্রগাঢ় ভালোবাসারও দেখা মেলে। ভাটি অঞ্চলের জনজীবন ও কৃষ্টিকে দারুণ জনপ্রিয় করে দিয়েছিলেন আমাদের শহুরে মানুষদের কাছে। নগরজীবনের অনন্য রূপকার হয়েও বাংলার আবহমান লোকজীবনের নিখুঁত বয়ান এবং দৃশ্যায়ন দেখি তাঁর শিল্পকর্মে।

হুমায়ূনের চলচ্চিত্রে নারী চরিত্রগুলো এসেছে চিরায়ত বাংলার সামাজিক পরিমণ্ডলের ভেতর থেকে। তাঁর নারীরা অবদমিতই থাকে। আমাদের পুরুষশাসিত সমাজে সংস্কার ও ধর্মীয় বলয়ের শিকার হয়ে নারীর করুণ পরিণতি দেখা যায়, তাঁর চলচ্চিত্রের নারীদের পরিণতিও একই রকম। আবার নারীর মাঝে মাতৃত্ব সত্তার স্বরূপ লক্ষ করা যায় চন্দ্রের মায়ের রূপায়ণে। একই রকমভাবে *আগুনের পরশমণি*তে রাত্রিকে দেখানো হয় বহুমাত্রিক মাতৃসত্তার প্রতিচ্ছবি হিসেবে। *ঘেটুপুত্র কমলা*য় হেকমত-স্ত্রী হামিদার অন্তঃক্ষরণ ঘটে ক্রমাগত। কমলাকে নিজ হাতে সাজিয়ে স্বামীর কাছে পাঠানোর মধ্য দিয়ে বাংলার চিরায়ত নারীর দুর্দশাকেই তুলে ধরেছেন হুমায়ূন। হেঁয়ালিপনার মধ্য দিয়ে সমাজ বাস্তবতায় নারীর প্রতি বিদ্রুপাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিও দেখা যায় হেকমতের সংলাপে। যখন হেকমত হামিদাকে বলে, কইতর ধান ছিটাইলেই আসে।

সাহিত্যের মতো বৃষ্টি ও জ্যোৎস্না তাঁর চলচ্চিত্রে জায়গা পেয়েছে বিশেষ মাত্রা নিয়ে। তিনি এক সাক্ষাৎকারে প্রকৃতির এই অপার বিস্ময়ের প্রতি তাঁর দুর্বলতার কথা জানিয়েছিলেন এভাবে, বৃষ্টি ও জোছনা– প্রকৃতির এই দুটি বিষয়ের ওপর আমার প্রবল একটা আকর্ষণ আছে। আমি দুটোই সেলুলয়েডে ধরার চেষ্টা করেছি। জোছনা কখনোই ধরতে পারি নাই। বহু চেষ্টা করেছি। যা বলেছেন ক্যামেরাম্যানরা আমি তাই শুনেছি, যা করতে বলেছেন তাই করেছি তারপরেও কখনোই জোছনা সে অর্থে ধরা যায়নি।

বাংলাদেশের অধিকাংশ বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রে বর্ষা এসেছে প্রেমময় নৃত্যগীতে, আকর্ষণীয় সৌন্দর্য প্রকাশে। কখনো ইন্দ্রিয়মুখী সুখানুভব সৃষ্টিতে, আবার কখনো উত্তেজক, সাংঘর্ষিক আবহ সৃষ্টিতে। বৃষ্টি ধরার ব্যাপারে বলেছিলেন, *শ্রাবণ মেঘের দিন*-এ খুব ভালোভাবে বৃষ্টি ধরতে পেরেছি। আমার বহু সময় লেগেছে বৃষ্টিটাকে আয়ত্ত করতে। পরে *নয় নম্বর বিপদ সংকেত*-এ বৃষ্টিটাকে আমি ঠিকভাবে ধরতে পেরেছি।

বৃষ্টি ও জ্যোৎস্নার প্রসঙ্গ এলে মনে পড়ে যায় সেই কথাগুলো ‘কোনো কোনো রাতে অপূর্ব জোছনা হয়। সারা ঘর নরম আলোয় ভাসতে থাকে। ভাবি, একা একা বেড়ালে বেশ হতো। আবার চাদর মুড়ি দিয়ে নিজেকে গুটিয়ে ফেলি। যেন বাইরের উথালপাথাল চাঁদের আলোর সঙ্গে আমার কোনো যোগ নেই। মাঝে মাঝে বৃষ্টি নামে। একঘেঁয়ে কান্নার সুরের মতো সে শব্দ। আমি কান পেতে শুনি। বাতাসে জাম গাছের পাতার সর সর শব্দ হয়। সব মিলিয়ে হৃদয় হা হা করে উঠে। আদিগন্ত বিস্তৃত শূন্যতায় কি বিপুল বিষণ্নতাই না অনুভব করি। জানালার ওপাশের অন্ধকার থেকে আমার সঙ্গীরা আমায় ডাকে। একদিন যাদের সঙ্গ পেয়ে আজ নিঃসঙ্গতায় ডুবছি...’(*শঙ্খনীল কারাগার*)।

প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে আনন্দ ও বিষাদের যুগপৎ অনুভূতি; সব থেকেও কী যেন নাই-এর মতো এক অচেনা নৈঃশব্দবোধ!

হুমায়ূন আহমেদের চলচ্চিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রধান চরিত্রের মৃত্যু। *আগুনের পরশমণি*তে মুক্তিযোদ্ধা বদি, *শ্রাবণ মেঘের দিন*-এর কুসুম, *ঘেটুপুত্র কমলা*য় কমলার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ হয় কাহিনি। এই মৃত্যুগুলো চলচ্চিত্রের অপ্রকাশিত বক্তব্যকে শৈল্পিকভাবে উন্মোচিত করে যেন প্রতিটি মৃত্যু দর্শকের স্বপ্নে আঘাত করে। একাত্তরে হুমায়ূন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেছেন। এ কারণেই কি না, সাহিত্যের মতো তাঁর চলচ্চিত্রেও মৃত্যু এসেছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে।

*চন্দ্রকথা*য় চন্দ্র এবং *আগুনের পরশমণি*তে বদির মৃত্যুর দৃশ্যকে তিনি কত সুন্দরভাবেই না দৃশ্যায়ন করেছেন! *আগুনের পরশমণি*তে মৃত্যুপথযাত্রী বদিউল আলম রাত্রির কথায় ভোর দেখার জন্য তাকাল। ভোরের আলোকে ছোঁয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলো। কাট টু মুক্ত আকাশে এক ঝাঁক পায়রা ডানা মেলে দিল। রক্তাক্ত সূর্য। নেপথ্যে বেজে ওঠে– ‘আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে’।

রহস্যময়তার প্রতি তাঁর এক ধরনের আকর্ষণ ছিল। তাঁর বেশির ভাগ লেখালেখিতে, টিভি নাটকে, চলচ্চিত্রে একটা বড়ো অংশজুড়েই আছে রহস্যময়তা।

৬

মাঝে মাঝে মনে হয় সিনেমা বানানোর সময় হুমায়ূনের মনস্তত্ত্ব অনেকটা জাঁ লুক গদারের মতো। গদারের ভাবখানা এমন ছিল যে, চুলোয় যাক পারফেকশনের গজদন্তমিনার। আমি ভালোয়-মন্দয় দোষে-গুণে একজন মানুষ ছবি করছি এবং যেভাবে ছবি করছি সেটা তার সমস্ত সজীবতায় দর্শকদের কাছে পৌঁছে যাক। হুমায়ূনও নিজে ফিল্ম বানাতে চেয়েছেন, বানিয়েছেন এবং তা দর্শকদের কাছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধরা দিয়েছে। আজও আমাদের হৃদয়ে সজীব হয়ে আছে। মানব মনস্তত্ত্বের অদেখা ভুবন উন্মোচনে তিনি ছিলেন এক বিস্ময়কর ও কুশলী কারিগর।

শঙ্খনীল কারাগার-এর মন্টু যখন লিখেন– ‘দিতে পার একশ ফানুস এনে?

আজন্ম সলজ্জ সাধ একদিন আকাশে কিছু ফানুস উড়াই।’ তখন তো হুমায়ূনই লিখেন। তিনি তো তাঁর গল্প-উপন্যাস-নাটক-চলচ্চিত্রে ফানুসই ওড়াতে চেয়েছিলেন। উড়িয়েছেনও। আজও কোটি কোটি পাঠকের মনের আকাশে তাঁর একশো ফানুস উড়ছে প্রতিক্ষণ।

তথ্যসূত্র

মাহবুব আলম, *চলচ্চিত্র ভাবনা*, ভাষা চিত্র, ঢাকা, ২০০৯

সুগত সিংহ, *বাস্তবোত্তর চলিচ্চত্র এবং আরও কিছু*, সহজপাঠ্য, কলকাতা, ২০১৪

গাস্তঁ রোবেজ, *নতুন সিনেমার সন্ধানে*, বাণীশিল্প, কলকাতা, ১৯৮৪

শাহাদাৎ রুমন, *হুমায়ূন আহমেদের চলচ্চিত্র: চিরায়ত রসবোধ*, ভাষা চিত্র, ঢাকা, ২০১৮

মতিন রহমান, *হুমায়ূন আহমেদ-এর শেষ ও প্রথম চলচ্চিত্র*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩

বিধান রিবেরু, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র*, আত্মজা, কলকাতা, ২০১৭

আহমেদ মাওলা, *হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস: কতিপয় শিল্পসূত্র*, কালি ও কলম, নভেম্বর, ২০১৭

ইন্টারনেট থেকে

২০০৭ সালে নয় নম্বর বিপদ সংকেত মুক্তি পাওয়ার পর সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র কর্মী শফিউজ্জামান খান লোদীর কাছে দেওয়া হুমায়ূন আহমেদ-এর সাক্ষাৎকার

পরীক্ষিৎ চৌধুরী: লেখক ও সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা, 1parcho@gmail.com

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. অসীম দাস

১৯২১ সালের পহেলা জুলাই। মাত্র ৩টি অনুষদ, ১২টি বিভাগ, ৬০ জন শিক্ষক ও ৮৪৭ জন শিক্ষার্থী নিয়ে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক পথচলা শুরু হয়েছিল, তা আজ বিশাল এক মহীরূহে রূপান্তরিত হয়েছে; অভিহিত হয়েছে 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' হিসেবে। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। এ প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে ইতিহাসের নানা অধ্যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মানেই বাঙালি জাতির এক গৌরবময় ইতিহাস। ঐতিহ্য, সংগ্রাম আর সাফল্যগাথার এই বিশ্ববিদ্যালয় আজ ১০২ বছর পেরিয়ে ১০৩তম বর্ষে পদার্পণ করল। শুভ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী প্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পূর্ব বাংলা তথা সমগ্র বাঙালিকে আধুনিক উচ্চ শিক্ষা ও আলোকিত ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখানোর জন্য শতবর্ষের অধিককাল আগে ১৯২১ সালে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকে 'শিক্ষাই আলো'- স্লোগান সংবলিত মনোগ্রাম নিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয় জাতির সংকটে সত্যিকারের আলোর দিশারি হয়ে এখনও পথ দেখাচ্ছে, তার গতিশীল ধারাও প্রবহমান রেখেছে। বহুকাল ধরে এই অঞ্চলের আপামর মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক, ও রাজনৈতিক মুক্তির বীজ নিহিত আছে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি কিনারায়। স্বমহিমায় উদ্ভাসিত প্রাণের এই বিশ্ববিদ্যালয় গোটা বাংলাদেশকে যেমন প্রতিনিধিত্ব করে, তেমনি সমগ্র জাতিকে দুর্দান্ত প্রতাপে বিশ্ব আঙ্গিনায় পরিচিত করেছে অদম্য মেধাবী হিসেবে। তোমার প্রতিষ্ঠা দিবসে তোমাকে জানাই প্রণতি।

প্রথিতযশা সাহিত্যিক আহমদ ছফা যথার্থই বলেছিলেন, 'ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের এই দেশটির যা কিছু আশা-ভরসার, তার সবটাই তো ধারণ করে এই (ঢাকা) বিশ্ববিদ্যালয়'। সত্যিই বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে যতটুকু অর্জন, তার বেশিরভাগ অর্জিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই আবির্ভূত হয়েছেন দেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, গবেষক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং সামাজিক আন্দোলনের বলিষ্ঠ সব কণ্ঠস্বর। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বেই রোপিত হয়েছে জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের বীজ; যা বিশ্বায়নের এ যুগে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ঈর্ষণীয় সফলতার মাধ্যমে দেশকে নিয়ে গিয়েছে অনন্য এক গর্বিত শিখরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার গৌরবান্বিত অতীত আর বিশাল সমৃদ্ধ বর্তমানকে আবর্তন করে যুগোপযোগী টেকসই উন্নয়নের পথে বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হবে– ১০২ বছর পূর্তিতে এটাই পুরো জাতির প্রত্যাশা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের গৌরব, আমাদের অহংকার। এদেশের শিক্ষাবিস্তার, গবেষণা কার্যক্রম ও স্বাধিকার আন্দোলন সংগ্রামের দীর্ঘ পথচলায় তিন কালের (ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ) সাক্ষী হিসেবে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন', ৫২'র ভাষা আন্দোলন', ৬৬'র শিক্ষা আন্দোলন', ৬৯'র গণ অভ্যুত্থান', ৭১'র মহান মুক্তিযুদ্ধ', ৯০'র স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন এবং সর্বশেষ ১/১১ সরকারের পতনের আন্দোলনে সামনে থেকে কার্যকর নেতৃত্ব দিয়েছে এই বিদ্যাপীঠ। গৌরবোজ্জ্বল এ পথচলায় যে সকল প্রাক্তন শিক্ষার্থী এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে মহিমান্বিত করে গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচিত, তিনি হলেন বাঙালির মুক্তির মহানায়ক, মহান স্বাধীনতার স্থপতি, আধুনিক বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তৎকালীন পূর্ব বাংলার জমিদার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, নবাব নওয়াব আলী

চৌধুরী ও শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকসহ আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির কর্মপ্রয়াসের ফলস্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এছাড়া আরও অনেক মনীষী শিক্ষকের অবদানে এ বিশ্ববিদ্যালয় ধন্য হয়ে ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সেসব পণ্ডিত ও গুণীজনের প্রতিও জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা।

২০২১ সাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি বছর ছিল। সেই বছরটি একদিকে মুজিববর্ষ, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শততম বর্ষ। মুজিববর্ষ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিচ অ্যান্ড লিবার্টি' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশ ও জনগণের সর্বাঙ্গীন কল্যাণে উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে নিবেদিত এ বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে যুগোপযোগী গবেষণা ও শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে অনুপ্রেরণা দিতে ও প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই দিনে আমাদের আকাঙ্ক্ষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেন শিক্ষা-গবেষণায় আরও উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জন করতে পারে।

স্বাধীনতা পূর্ব এই অঞ্চলের অর্থাৎ অবহেলিত পূর্ব বাংলার নানা ধরনের কর্মক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মের সৃজনশীলতা ও নেতৃত্ব সৃষ্টিতেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অনস্বীকার্য। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন এক প্রাণোচ্ছল পরিবেশের উদ্ভব ঘটে, শিক্ষার্থীদের প্রাণে সঞ্চারিত হয় মুক্তি আন্দোলনের রক্তিম সেই অধ্যায়ের আবেগ। এই ক্যাম্পাসে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মুক্তবুদ্ধির অবাধ চর্চার ক্ষেত্রেও এক নবদিগন্তের সূচনা হয়। বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী শিক্ষা দর্শন ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্য থেকেই স্বাধীনতা-পরবর্তী সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স ১৯৬১ বাতিল করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৭৩ জারি করে; যার ফলস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বকীয়তা, বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলন, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুজ্জীবিত হয়। এই কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অভিহিত করা হয় দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক ও পরিশীলিত বিদ্যা চর্চার সূতিকাগার হিসেবে। বর্তমান সময়ের সমাজ- সংস্কৃতি-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক প্রাঙ্গণে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা আরও বেগবান হবে– বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

বিশ্বময় নন্দিত, উদ্ভাসিত, নিজ আলোয় ভাস্বর এ বিদ্যাপীঠটির এ বছরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর প্রতিপাদ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে 'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিশ্ববিদ্যালয়'— যা বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় অত্যন্ত গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য মহোদয় দেশবরেণ্য ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপকার হিসেবে এই প্রতিপাদ্য নির্বাচন করেছেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা গণতন্ত্রের মানসকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত 'রূপকল্প—২০৪১' বা 'স্মার্ট বাংলাদেশ–২০৪১' লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই উপজীব্য নির্বাচন নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। আগামী দুই দশকের মধ্যে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উন্নত প্রযুক্তি নির্ভরতার মাধ্যমে বাংলাদেশকে এক সমৃদ্ধিশীল দেশে রূপান্তর করার লক্ষ্য ও ব্রত নিয়ে বাংলাদেশের বর্তমান সরকার 'স্মার্ট বাংলাদেশ–২০৪১' বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আর এই স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এবং গর্বিত অংশীদার হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর ঘোষণায় বিভিন্ন স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হাতে নেওয়ার আশাব্যঞ্জক ইঙ্গিত প্রদান করেছে।

'স্মার্ট বাংলাদেশ' স্লোগানের মূল চার ভিত্তির (স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট অর্থনীতি ও স্মার্ট সমাজ) প্রথমটি অর্জনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বোচ্চ পৃষ্ঠপোষকতা করবে যেখানে প্রযুক্তি আর মানবিক মূল্যবোধের এক সুসমন্বিত প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপাচার্য নিশ্চিত করেছেন। আর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজারো মেধাবী শিক্ষার্থী স্মার্ট নাগরিক হিসেবে তৈরি হলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই স্মার্ট অর্থনীতির বুনিয়াদ তৈরিতে অবদান রাখতে পারবে; যার ফলশ্রুতিতে স্মার্ট সরকার ও স্মার্ট সমাজের দৃঢ় ও স্থায়ী ভিত রচিত হবে। দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে– বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে এটা সকলের প্রত্যাশা।

প্রাচ্যের বাতিঘর হিসেবে খ্যাত বাংলাদেশের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম ঐতিহ্যবাহী উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় যেসব দুর্লভ সাফল্য অর্জন করেছে, তা দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আরও বিস্তৃত হোক, সেই অর্জনের মহিমা আর শক্তি দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশ ও মানুষের কল্যাণে আরও অবদান রাখুক, বাংলাদেশ ধাবিত হোক অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায়, এক সোনালি স্বপ্নের অসীম দিগন্তে। প্রাণের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তোমার প্রতিষ্ঠা দিবসে তোমাকে আবারও জানাই সশ্রদ্ধ ভালোবাসা, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

ড. অসীম দাস: সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, asim.ier@du.ac.bd

'এজেন্সি টু ইনোভেট' নতুন সরকারি সেবা

এজেন্সি টু ইনোভেট (এটুআই) নামে নতুন একটি সংস্থা গঠন করতে জাতীয় সংসদে একটি বিল পাস হয়। সরকারি সেবার ডিজিটাল রূপান্তর নিশ্চিত ও টেকসই করার লক্ষ্যে এ সংস্থা করা হচ্ছে। এটি হবে মূলত বর্তমান এটুআই প্রকল্পের স্থায়ী কাঠামো। নতুন এ সংস্থা গঠনের লক্ষ্যে 'এজেন্সি টু ইনোভেট (এটুআই) বিল ২০২৩' ৫ই জুলাই জাতীয় সংসদে পাস হয়। বিলটি পাসের জন্য সংসদে তোলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। বিলের ওপর দেওয়া জনমত যাচাই-বাছাই কমিটিতে প্রেরণ ও সংশোধনী প্রস্তাবগুলো নিষ্পত্তি শেষে বিলটি কণ্ঠ ভোটে পাস হয়। এর আগে স্পিকার ড.শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে সংসদ অধিবেশন শুরু করা হয়। এজেন্সির পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিচালনা পর্ষদের ওপর ন্যস্ত থাকবে। এটি ১৮ সদস্যের পরিচালনা পর্ষদের সমন্বয়ে গঠন করা হবে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী বোর্ডের চেয়ারম্যান হবেন, যা স্বায়ত্তশাসিত হবে। প্রতিবছর পরিচালনা পর্ষদের অন্যূন দুটি সভা হবে।

এছাড়া এজেন্সি একটি নীতি তৈরি করবে যা উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার পরিবেশ তৈরি করতে সহায়তা করবে।

প্রতিবেদন: লায়লা জাহান

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট: একটি পর্যালোচনা

এম এ খালেক

একাদশ জাতীয় সংসদের সর্বশেষ বাজেট অধিবেশনে ১লা জুন ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি হচ্ছে সরকারের বর্তমান মেয়াদের শেষ বাজেট। এই বাজেট বাস্তবায়নকালেই অনুষ্ঠিত হবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। কাজেই এবারের বাজেট নানা কারণেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এটি বর্তমান অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল উপস্থাপিত পঞ্চম জাতীয় বাজেট এবং স্বাধীন বাংলাদেশের ৫৩তম

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ১লা জুন ২০২৩ জাতীয় সংসদে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপন করেন– পিআইডি

বাজেট। এর মধ্যে ৫২টি পূর্ণাঙ্গ বাজেট এবং একটি ছিল খণ্ডিত বা আংশিক বাজেট। এর মধ্যে প্রস্তাবিত বাজেটসহ আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিভিন্ন সময় সর্বাধিক ২৫টি বাজেট উপস্থাপন করা হয়। বিএনপির আমলে বিভিন্ন সময় মোট ১৭টি বাজেট উপস্থাপন করা হয়। আর সেনা শাসক এরশাদ আমলে মোট ৯টি বাজেট প্রণীত হয়। বাংলাদেশে সর্বাধিক ১২টি করে বাজেট প্রণয়ন করেন বিএনপি দলীয় অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান ও আওয়ামী লীগ দলীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২-১৯৭৩ অর্থবছরের জন্য প্রথম বাজেট প্রণয়ন করেছিলেন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। সেই বাজেটের আকার ছিল ৭৮৬ কোটি টাকা।

বাজেট একটি গতানুগতিক প্রক্রিয়া। সরকার একটি নির্দিষ্ট বছরে কোন খাতে কত অর্থ ব্যয় করবে এবং কোন খাত থেকে সেই অর্থ আহরিত হবে– এর একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল হচ্ছে জাতীয় বাজেট। জাতীয় বাজেটের মাধ্যমে একটি সরকারের নীতি-কৌশল এবং জনকল্যাণমূলক কাজের চিত্র প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তাই প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে সব মহলেই কমবেশি আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য যে বাজেট প্রস্তাবনা জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে, তা এমন এক সময় প্রণয়ন করা হয়েছে যখন বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা বিরাজ করছে। নানা ধরনের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক টানাপড়েনের কারণে বিশ্ব অর্থনীতির স্বাভাবিক গতি স্তিমিত হয়ে পড়েছে। বিশ্ব অর্থনীতি এখনও তিন বছর ধরে চলা করোনা অতিমারির প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এর মধ্যে ২০২২ সালের সূচনালগ্নে শুরু হয় রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ যে এতটা দীর্ঘমেয়াদি হবে তা অনেকেই অনুধাবন করতে পারেননি। বিশ্ব অর্থনীতির জন্য ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব হয়েছে অতি ভয়ংকর। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ন্যাটো জোটভুক্ত দেশগুলো রাশিয়ার ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে রাশিয়া ইউরোপীয় দেশগুলোতে জ্বালানি তেল ও খাদ্য পণ্য সরবরাহ বন্ধ অথবা কমিয়ে দেয়। ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে পুরো বিশ্বব্যাপী সাপ্লাই চেইন বিপর্যস্ত হয়। যুদ্ধরত দেশ দুটির কোনোটিই তাদের উৎপাদিত খাদ্য পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি করতে পারেনি। বিশেষ করে ইউক্রেন। গত মৌসুমে ইউক্রেনে মোট ৮ কোটি ৬০ লাখ টন খাদ্য পণ্য উৎপাদিত হয়। কিন্তু এই খাদ্য পণ্যের ৩০ শতাংশই যুদ্ধের কারণে মাঠ থেকে উত্তোলন করা সম্ভব হয়নি। খাদ্য পণ্যবাহী জাহাজগুলো সমুদ্রে আটকে থাকে অনেক দিন। যেসব দেশ নিজেরা খাদ্য পণ্য উৎপাদন করতে পারে না, আমদানির মাধ্যমে চাহিদা পূরণ করে তারা খুবই বিপাকে পড়ে যায়। আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য পণ্যের মূল্য হু হু করে বাড়তে থাকে। রাশিয়া এবং ইউক্রেন মিলিতভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে ৩০ শতাংশ খাদ্যের জোগান দিয়ে থাকে। আর রাশিয়া আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের এক-দশমাংশ জোগান দিয়ে থাকে। রাশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানি তেল রপ্তানিকারক দেশগুলো জ্বালানি তেলের উত্তোলন কমিয়ে দেয়। ফলে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেলের তীব্র সংকট দেখা দেয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বর্তমানে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে অস্বাভাবিক উচ্চমাত্রার মূল্যস্ফীতি। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধকতা কী তা জানতে চাইলে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, বাজেট একটি গতানুগতিক প্রক্রিয়া। প্রতিবছরই একটি নির্দিষ্ট সময়ে বাজেট ঘোষণা করা হয়ে থাকে। তবে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য বাজেট প্রণয়নের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে সবার মাঝেই এক ধরনের উৎকণ্ঠা লক্ষ করা গেছে। কারণ আগামী অর্থবছরের বাজেট এমন সময় ঘোষিত হতে যাচ্ছে যখন বিশ্ব অর্থনীতি নানা সমস্যায় জর্জরিত। বিশ্ব অর্থনীতিতে বর্তমানে উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজ করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেনসহ কোনো কোনো দেশে মূল্যস্ফীতি অস্বাভাবিক মাত্রায় উন্নীত হয়েছিল, যা গত চল্লিশ বছরের মধ্যে আর কখনও প্রত্যক্ষ করা যায়নি। বর্তমান বিশ্বে কোনো দেশই বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে কোনো ঘটনা ঘটলে তার প্রভাব প্রায় প্রতিটি দেশের অর্থনীতির ওপরই পড়ে। শুধু বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রেই নয়, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে উচ্চমাত্রার মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখার বিষয়টি। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বর্তমানে যে উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজ করছে এর জন্য মূলত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অবস্থাই দায়ী। কারণ আন্তর্জাতিক অর্থনীতি গত কিছুদিন ধরে খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। বিশ্ব অর্থনীতি অনেকটাই স্থবির হয়ে পড়েছে। এই অবস্থাকে ঠিক মন্দা বলা যাবে না তবে প্রায় মন্দার কাছাকাছি চলে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর অর্থনীতিতে কোনো ধরনের সমস্যা দেখা দিলে তার প্রভাব নিশ্চিতভাবেই বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও পড়বে। বাংলাদেশে কিছু ব্যবসায়ী আছেন যারা সুযোগ পেলেই পণ্য মূল্য বৃদ্ধি করে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করে। আন্তর্জাতিক বাজারে যেহেতু বর্তমানে টালমাটাল অবস্থা বিরাজ করছে, এই সুযোগে স্থানীয় এক শ্রেণির ব্যবসায়ী বিভিন্ন পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে নিজেদের আখের গোছানোর চেষ্টায় রত রয়েছেন। তারা কৃত্রিমভাবে বাজারে বিভিন্ন পণ্যের ঘাটতি সৃষ্টি করে পণ্য মূল্য বৃদ্ধি করেন। আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি এবং স্থানীয় বাজারে এক শ্রেণির ব্যবসায়ীর কারসাজির কারণে মূল্যস্ফীতি উর্ধ্বমুখী ধারায় রয়েছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেট আসছে। বাজেটের দুটি দিক আছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে ফিস্ক্যাল দিক আর একটি মনিটারি দিক। বাজেটে দেশের অর্থনীতির প্রায় সব দিকই বিবেচনায় নিতে হয়। বাজেটের মূল লক্ষ্য থাকে কয়েকটি। যেমন– জিডিপি প্রবৃদ্ধি কতটা অর্জিত হবে, মূল্যস্ফীতি কীভাবে সহনীয় পর্যায়ে রাখা যাবে, বাজেট ঘাটতি কীভাবে কমিয়ে আনা যাবে এবং দারিদ্র্য বিমোচন কীভাবে সম্ভব হবে। আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে নানা সমস্যা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে। করোনাকালে বিশ্ব অর্থনীতি যখন বিপর্যস্ত অবস্থায় ছিল তখনও বাংলাদেশ উচ্চ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সাময়িক হিসাব অনুসারে, জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৭ দশমিক ২৫ শতাংশ। কিন্তু ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন কমিয়ে আনা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ বছর জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে সাড়ে ৬ শতাংশের কাছাকাছি। আন্তর্জাতিক যেসব সংস্থা বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন করে তারা সরকারের প্রাক্কলনের চেয়ে কিছুটা কম জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে বলে মত প্রকাশ করেছে। আমাদের চূড়ান্ত অবস্থা জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। অর্থনীতিবিদগণ মনে করছেন, সরকার জিডিপি প্রবৃদ্ধির যে প্রাক্কলন করেছে তার কাছাকাছিই অর্জিত হবে। আগামী অর্থবছরের (২০২৩-২০২৪) জন্য জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে সাড়ে ৭ শতাংশ। আগামী অর্থবছরে সাড়ে ৭ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে আমাদের অভ্যন্তরীণভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যাপকভাবে বাড়ানোর প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান খাত পণ্য রপ্তানি আয় গত কয়েক মাস ধরে কিছুটা নিম্নমুখী ধারায় রয়েছে। রেমিটেন্স প্রবাহও কিছুটা কমেছে। এখানে সরকারের কিছু করণীয় আছে। ব্যবসায়ীদেরও করণীয় আছে। বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ থেকে রপ্তানিকারকদের সহায়তা দেওয়া হতো এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের (ইডিএফ) আওতায়। এই ফান্ডের আকার ছিল ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। কিন্তু সেই সহায়তা ফান্ডের আকার পৌনে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে কমিয়ে আনা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে সৃষ্ট রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের আকার কিছুটা কমানো হলেও পাশাপাশি স্থানীয় মুদ্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার একটি তহবিল গড়ে তোলা হয়েছে, যার নামকরণ করা হয়েছে প্রি-ফাইন্যান্সিং ফান্ড। ব্যাংকের মাধ্যমে ৪ শতাংশ সুদ হারে এই ফান্ড থেকে রপ্তানিকারকদের অর্থ দেওয়া হবে। কাজেই বৈদেশিক মুদ্রায় রপ্তানিকারকদের দেওয়া তহবিলের পরিমাণ কমানো হলেও স্থানীয় মুদ্রায় তাদের নতুন ফান্ড থেকে অর্থের জোগান দেওয়া হবে। সরকার নানাভাবে চেষ্টা করছে তৈরি পোশাক রপ্তানি বাড়ানোর জন্য। এ জন্য নতুন নতুন বাজার খুঁজে বের করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকগণও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কীভাবে তৈরি পোশাক রপ্তানি আরও বাড়ানো যায়।

আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে গেছে। অনেকেই মনে করছেন, বাংলাদেশ সাংঘাতিকভাবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংকটে পড়তে যাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ে কোনো জটিল সমস্যায় পতিত হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। সর্বশেষ হিসাব মোতাবেক, বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ হচ্ছে ৩০ দশমিক ১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মতো। যদি রপ্তানি উন্নয়ন ফান্ডে দেওয়া রিজার্ভ অর্থ বাদ দেওয়া হয় তাহলে রিজার্ভের নিট পরিমাণ দাঁড়াবে ২৪ থেকে ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমাদের মাসিক আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ হচ্ছে গড়ে সাড়ে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ বর্তমান রিজার্ভ দিয়ে সাড়ে চার মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো যেতে পারে। অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, কোনো দেশের তিন মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর মতো বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থাকলেই তাকে স্বস্তিদায়ক বলে মনে করা যেতে পারে। আমাদের চেষ্টা করতে হবে কীভাবে আগামীতে রিজার্ভের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়। পণ্য রপ্তানি বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করতে হবে। একইসঙ্গে অপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি নিরুৎসাহিত করতে হবে। তবে আমাদের শিল্পে ব্যবহার্য কাঁচামাল, ক্যাপিটাল মেশিনারিজ এবং মধ্যবর্তী পণ্য আমদানি বাড়াতে হবে, যাতে শিল্পের উৎপাদন কোনোভাবেই ব্যাহত না হয়। শিল্পে ব্যবহার্য কাঁচামাল, ক্যাপিটাল মেশিনারিজ এবং মধ্যবর্তী পণ্য আমদানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় কমে গেছে। শিল্পের গতি যদি ঠিক না থাকে তাহলে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে না। দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কাজেই আমাদের যে-কোনো মূল্যেই হোক শিল্পকারখানার উৎপাদন ঠিক রাখতে হবে। দেশে নতুন নতুন শিল্পকারখানা স্থাপনের মতো পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। বর্তমান সরকার যেভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করে চলেছে তা অব্যাহত রাখার জন্যও দ্রুত এবং সুষম শিল্পায়ন প্রয়োজন। ব্যক্তি খাতে ব্যাংক ঋণের প্রবৃদ্ধি বেশ ভালো। তবে আমাদের দেখতে হবে, ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণের অর্থ যাতে শিল্প খাতে ব্যয় করা হয়।

একইসঙ্গে প্রবাসী বাংলাদেশিরা যে অর্থ উপার্জন করছে তা যাতে সঠিকভাবে বৈধ চ্যানেলে দেশে আসে তার ব্যবস্থা করতে হবে। সরকার প্রবাসী বাংলাদেশিদের নানা ধরনের নগদ আর্থিক প্রণোদনা দিচ্ছে। সরকার চেষ্টা করছে যাতে প্রবাসী বাংলাদেশিরা কষ্টার্জিত অর্থ বৈধ পথে দেশে প্রেরণ করেন। প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেওয়া প্রণোদনা আরও বাস্তবমুখী করতে হবে, যাতে তারা বৈধ পথে রেমিটেন্স প্রেরণে উৎসাহী হয়।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য যে বাজেট জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে, তার সার্বিক আকার হয়েছে ৭ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রস্তাবিত বাজেট চরিত্রগত দিক থেকে সম্প্রসারণমূলক বাজেট। বাজেটে রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ লাখ কোটি টাকা। বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ২ লাখ ৫৭ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে দেশের ব্যাংকিং সিস্টেম থেকে আসবে ১ লাখ ৩২ হাজার ৩৯৫ কোটি টাকা। বিদেশি ঋণ গ্রহণ করা হবে ১ লাখ ২ হাজার ৪৯০ কোটি টাকা। দেশের ব্যাংক বহির্ভূত খাত থেকে ঋণ পাওয়া যাবে ২৩ হাজার কোটি টাকা। বিদেশি অনুদান পাওয়া যাবে ৩ হাজার ৯০ কোটি টাকা। বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ২ লাখ ৫৭ হাজার ৮৮৫ কোটি টাকা। এটা জিডিপির ৫ দশমিক ২ শতাংশ।

বর্তমান সরকার শিক্ষাবান্ধব সরকার। প্রতিবছরই বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ ব্যয় বরাদ্দ দেওয়া হয়। আগামী অর্থবছরেও তার কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। আগামী অর্থবছরে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ১ লাখ ৪ হাজার ১৩৯ কোটি টাকা। ঋণের সুদ বাবদ ব্যয় করা হবে ৯৪ হাজার ৪৪১ কোটি টাকা। পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে ৮৬ হাজার ২০৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। ভর্তুকি ও আর্থিক প্রণোদনা খাতে ৮৪ হাজার ৫৪২ কোটি টাকা, জনপ্রশাসন খাতে ৫৫ হাজার ৯৩০ কোটি টাকা এবং স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন খাতে ৪৯ হাজার ৩৪২ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। স্বাস্থ্য খাতে ৩৮ হাজার ৫০ কোটি টাকা, সামাজিক কল্যাণ ও নিরাপত্তা খাতে ৩৫ হাজার ৩৩৫ কোটি টাকা, প্রতিরক্ষা খাতে ৩৪ হাজার ৯২২ কোটি টাকা, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে ৩৪ হাজার ৮১৯ কোটি টাকা, পেনশন ও গ্র্যাচুইটি খাতে ৩২ হাজার ৮৬৯ কোটি টাকা, জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা খাতে ৩১ হাজার ৮ কোটি টাকা, কৃষি খাতে ২৬ হাজার ১৭০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাতে ৫৪ হাজার ১০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। বাজেটে রাজস্ব আয় দেখানো হয়েছে ৫ লাখ কোটি টাকা। এর মধ্যে মূল্য সংযোজন কর থেকে আসবে ১ লাখ ৬৩ হাজার ৮৩৭ কোটি টাকা। আয় ও মুনাফা থেকে আসবে ১ লাখ ৫৩ হাজার ২৬০ কোটি টাকা। সম্পূরক শুল্ক থেকে ৬০ হাজার ৭০৩ কোটি টাকা, কর ব্যতীত রাজস্ব থেকে ৫০ হাজার কোটি টাকা, আমদানি শুল্ক থেকে ৪৬ হাজার ১৫ কোটি টাকা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বাইরে থেকে ২০ হাজার কোটি টাকা, অন্যান্য খাত থেকে আসবে ৬ হাজার ১৮৫ কোটি টাকা।

জাতীয় বাজেট ২০২৩-২০২৪

বাজেট	৫৩তম (অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটসহ)
বাজেট ঘোষণা	১লা জুন ২০২৩
বাজেট ঘোষক	অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল
বাজেট পাস	২৬শে জুন ২০২৩
বাজেট কার্যকর	১লা জুলাই ২০২৩ থেকে
মোট বাজেট	৭,৬১,৭৮৫ কোটি টাকা
সামগ্রিক আয় (রাজস্ব ও অনুদানসহ)	৫,০৩,৯০০ কোটি টাকা
রাজস্ব আয়	৫,০০,০০০ কোটি টাকা
বৈদেশিক অনুদান	৩,৯০০ কোটি টাকা
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)	২,৬৩,০০০ কোটি টাকা (বাজেটের ৩৪.৫%) মোট ব্যয় : ৭,৬১,৭৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে পরিচালন ব্যয় (আবর্তক ও মূলধন ব্যয়), খাদ্য হিসাব, ঋণ ও অগ্রিম (নিট) এবং উন্নয়ন ব্যয়
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদানসহ)	২,৫৭,৮৮৫ কোটি টাকা
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	২,৬১,৭৮৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.২%)
অর্থসংস্থান	২,৫৭,৮৮৫ কোটি টাকা
বৈদেশিক ঋণ (নিট)	১,০২,৪৯০ কোটি টাকা
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১,৫৫,৩৯৫ কোটি টাকা
মোট জিডিপি	৫০,০৬,৭৮২ কোটি টাকা
অনুমিত বিষয় জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি	৭.৫%
মূল্যস্ফীতি	৫.৬%

অর্থমন্ত্রী একটি সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি জাতীয় সংসদকে জানিয়েছেন, বাংলাদেশ এখন বিশ্ব অর্থনীতিতে ৩৫তম অবস্থানে রয়েছে। এক সময় বাংলাদেশ বিশ্বের ১০টি দরিদ্র দেশের অন্যতম ছিল। বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এটা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। করোনাকালীন অবস্থাতেও বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা অব্যাহত ছিল। এখনও আছে। বাংলাদেশ বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। আগামী অর্থবছরের জন্য জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭ দশমিক ৫০ শতাংশ। অর্থনীতিবিদদের অনেকেই মনে করছেন, প্রবৃদ্ধির এই লক্ষ্যমাত্রা মোটেও অবাস্তব বা উচ্চাভিলাষী নয়। এটা অর্জনযোগ্য। মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ জন্য আমদানি ব্যয় হ্রাসসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। আগামী অর্থবছরের মধ্যে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের হার জিডিপির ২৭ শতাংশে উন্নীত করার

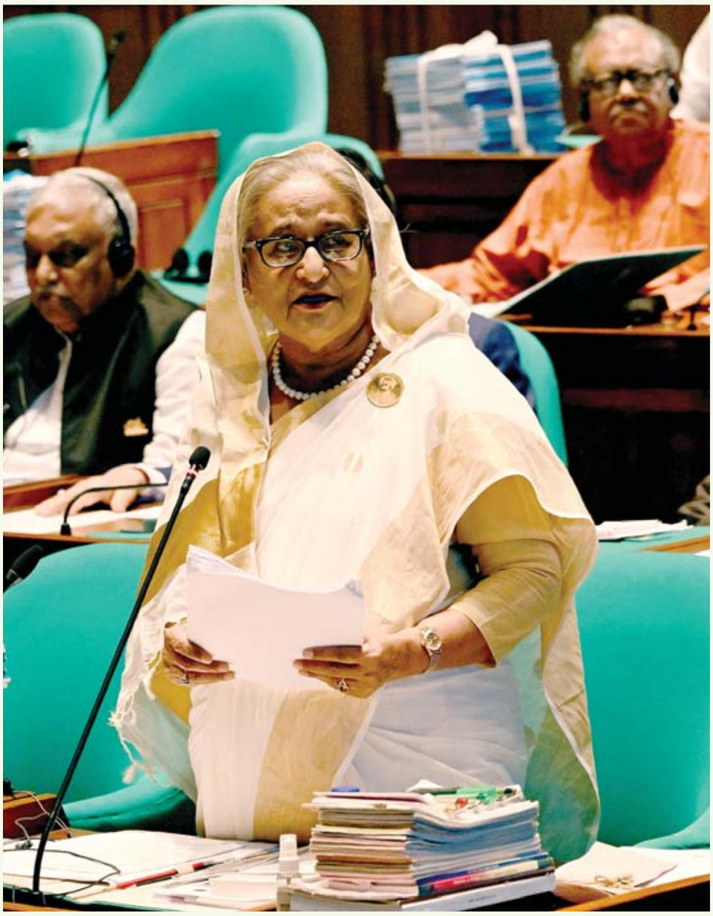

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে জুন ২০২৩ একাদশ জাতীয় সংসদের ২৩তম অধিবেশনে বাজেট আলোচনায় বক্তব্য প্রদান করেন– পিআইডি

আগামী অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটের সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হচ্ছে উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনা। বৈশ্বিক কারণেই মূলত অভ্যন্তরীণ বাজারে উচ্চ মূল্যস্ফীতি সৃষ্টি হয়েছে। সরকার মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে। অর্থমন্ত্রী বাজেটোত্তর সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, সরকার উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ে চিন্তায় আছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য অভ্যন্তরীণভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। সরকার অচিরেই বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বাজারের উপর ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই উদ্যোগ অর্থনীতির জন্য সুফল বয়ে আনবে। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার যদি বাজারভিত্তিক করা হয় তাহলে আগামীতে রেমিটেন্স এবং রপ্তানি আয় বৈধ চ্যানেলে দেশে আসার পরিবেশ সৃষ্টি হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক পলিসি রেট গত এক বছরের মধ্যে অন্তত তিনবার বাড়িয়েছে। পলিসি রেট বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ একটি সাধারণ কৌশল। এতে বাজারে অর্থ সরবরাহ কমে যায়। গত এক বছরে বিশ্বের অন্তত ৭৭টি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক পলিসি রেট বাড়িয়ে তাদের মূল্যস্ফীতি কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে আনার ক্ষেত্রে অনেকটাই সফল হয়েছে।

চলতি অর্থবছরে বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ৭ শতাংশ ট্যাক্স প্রদানের বিপরীতে দেশে প্রত্যর্পণের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই সুযোগ ব্যবহার করে কোনো পাচারকৃত অর্থ দেশে আসেনি। তাই আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে এই সুযোগ রহিত করা হয়েছে। আগামী অর্থবছরের বাজেটে সিগারেটের আরোপিত সম্পূরক শুল্ক বাড়ানো হয়েছে। ফলে এই পণ্যটির দাম বাড়তে পারে। সরকার আগামী অর্থবছরে সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দ এবং ভাতাভোগীদের সংখ্যা বাড়িয়েছে। বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। চলতি অর্থবছরে বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ছিল ৫৭ লাখ ১ হাজার। আগামী অর্থবছরে তা ৫৮ লাখ ১ হাজার করা হয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে আমাদের এখনই উদ্যোগ নিতে হবে। বিনিয়োগ পরিবেশ আরও উদ্যোক্তাবান্ধব করতে হবে। এছাড়া রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সুশাসন আরও বৃদ্ধি করতে হবে। এক বছরের ব্যবধানে ইনভেস্টমেন্ট-জিডিপি রেশিও হয়ত ৪ শতাংশ বাড়ানো যাবে না, তবে উদ্যোগ নিতে অসুবিধা কোথায়? আর দেশের বিভিন্ন স্থানে যে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বাস্তবায়িত হচ্ছে সেগুলো পুরোদমে চালু হলে বিনিয়োগ নিশ্চিতভাবে অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে।

প্রস্তাবিত বাজেটের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, এতে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। এতে সমাজের একটি বিশাল গোষ্ঠী আর্থিক নিরাপত্তার আওতায় চলে আসবে। ব্যক্তি খাতে আয় করমুক্ত সীমা সাড়ে তিন লাখ টাকা করা হয়েছে। নারীদের ক্ষেত্রে এটা চার লাখ টাকা। এটা সময়ের প্রয়োজনেই করা হয়েছে। আর নারীদের ক্ষেত্রে ব্যক্তি খাতে আয়কর মুক্ত সীমা ৪ লাখ টাকা করায় যেসব নারী ক্ষুদ্র উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত তারা লাভবান হবেন। স্থানীয় শিল্পকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য আগের উদ্যোগগুলো অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এতে শিল্পায়নের গতি বাড়বে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

কোনো কোনো মহল থেকে বলা হচ্ছে, সরকার আইএমএফর শর্ত মেনে বাজেট প্রণয়ন করেছে। আইএমএফ যেসব শর্ত দিয়েছে তার মধ্যে যেগুলো দেশের অর্থনীতির জন্য মঙ্গলজনক শুধু সেগুলোই বাজেটে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আইএমএফ শর্ত দিয়েছে বলেই তা মানা হচ্ছে এমনটি নয়। উদাহরণ হিসেবে ভর্তুকির প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। আইএমএফ চাচ্ছে সব ক্ষেত্রেই ভর্তুকি ব্যাপকভাবে কমিয়ে ফেলা হোক। কিন্তু সরকার এই শর্ত মানতে রাজি হয়নি। কৃষি খাত এবং অন্যান্য খাতে ভর্তুকি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটে বিভিন্ন খাতে ভর্তুকি দেওয়া হবে ১ লাখ ১০ হাজার ৬৭২ কোটি টাকা।

বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে বাজেট প্রণয়ন করা সব সময়ই বেশ কঠিন কাজ। সরকার নানাভাবে সেই কঠিন কাজটিই সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে। অর্থমন্ত্রী তার বাজেট প্রস্তাবনায় বেশ মুনশিয়ানা প্রদর্শন করেছেন। বাজেট যাতে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বাড়িয়ে না দেয় সেই প্রচেষ্টা ছিল। এখন প্রস্তাবিত বাজেট যাতে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

এম এ খালেক: অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড ও অর্থনীতি বিষয়ক লেখক

নিবন্ধ

টেকসই সমবায়ে প্রয়োজন নারীর অংশগ্রহণ

হাছিনা আক্তার

সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমবায় একটি সম্ভাবনাময় শক্তি। দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তিতে সহায়ক হতে পারে সমবায়। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সমবায়কে দেশের কৃষি ক্ষেত্রে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

নেতৃত্ব সৃষ্টি, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ের সাথে অধিক হারে নারীদের সম্পৃক্ত করা আবশ্যক। নারীদের অংশগ্রহণ ছাড়া দেশে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। সমবায় সেক্টরে নারীদের অংশগ্রহণ বেশি হলে দুর্নীতি কমবে। কাজ বেশি হবে, প্রতিটি পরিবার উপকৃত হবে। সমবায়ে সরকার মনোনীত সদস্য নিয়োগকালে অবশ্যই নারী সদস্যকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ ব্যাপারে সমবায় অধিদপ্তরকে কাজ করতে হবে।

বর্তমান সরকার সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এবং জাতীয় সমবায় নীতিমালা ২০১২ প্রণয়ন করেছে। সমবায় সমিতি আইন ২০১৩ সালে সংশোধন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে। সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধন ২০২০) প্রণয়ন করে গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

সমবায়ের শাব্দিক অর্থ হলো সম্মিলিত উদ্যোগ বা প্রচেষ্টায় কাজ করা। এটি একটি গণমুখী আন্দোলন যা জাতির দর্পণ হিসেবে কাজ করে। সমবায় সংগঠনের ধারণা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায় একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবেই বিবেচিত হয়। তবে সমবায় সমিতিতে নারীদের অংশগ্রহণ এখনও কম। বাংলাদেশে মোট সমবায়ীর মাত্র ২৩/২৪ শতাংশ নারী। এটা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করিবেন'। সমবায়ের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার কৌশল ছিল সমবায়। জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে তৃণমূল পর্যন্ত উন্নয়নের ছোঁয়া পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে দেশের সব নাগরিকের জন্য সমান নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে একটি অগ্রগামী দেশ। বিশ্বের অনেক দেশের কাছেই এক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বাংলাদেশ। শিক্ষা, গবেষণা, রাজনীতি, প্রশাসন, পররাষ্ট্র, বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীভুক্ত নারীদের উন্নয়নে সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বর্তমান যুগে ডিজিটাল বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলে সমবায়ের মাধ্যমেই দেশের উন্নয়ন করা সম্ভব। সমবায়ের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে যুগোপযোগী সমবায় ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার জন্য আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য দক্ষ সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। সমবায়ের কাজে যারা দক্ষ, তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। বর্তমান সরকার 'উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান

উন্নয়ন' প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এর মাধ্যমে নারীদের সুদবিহীন, জামানতবিহীন, দীর্ঘমেয়াদি ১ লাখ ২০ হাজার টাকা করে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

সমবায়ের মূলমন্ত্র একতা, সাম্য, সহযোগিতা, সততা, আস্থা ও বিশ্বাস, সেবা এবং গণতন্ত্র। সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে দেশে টেকসই সমবায় গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি। ইউরোপে সূচিত সমবায় বাংলাদেশে আসে অনেক বিলম্বে। ১৯০৪ সালে বাংলাদেশে সমবায়ের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। প্রথমে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯১২ সালে কৃষি খাতে অর্থায়নের নিমিত্তে সমবায় ব্যাংকের যাত্রা শুরু হয়। ষাটের দশকে ড. আখতার হামিদ খান উদ্ভাবিত দ্বি-স্তর সমবায় বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হলে সমবায়ের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে।

চিরায়ত সমবায়ের সবচেয়ে বড়ো সাফল্য ক্ষুদ্র ঋণ উদ্ভাবন। ব্রিটিশ আমল থেকেই এ দেশে চালু রয়েছে ক্ষুদ্র ঋণ ও সঞ্চয়। বাংলাদেশে প্রাথমিক সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি, প্রাথমিক কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন এবং প্রাথমিক কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সমবায় সমিতি ইত্যাদি ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রায় ১,৯২,৬৯২টি। ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা পুরুষ প্রায় ৯,১৫,৫৬,৬৩৯ জন এবং নারী প্রায় ২৮,৮৫,৪৫৬ জন (সূত্রঃ সমবায় অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট)। এরা নিজেরা সঞ্চয় করে, ঋণও দেয়।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সমবায় আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। এ কারণেই জাতির পিতা সমবায়কে আমাদের সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদে সংযুক্ত করে গেছেন। সমবায় ছিল জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন পূরণের হাতিয়ার। তিনি কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, শিল্প উদ্যোগ, কৃষিঋণসহ সর্বক্ষেত্রে সমবায়ভিত্তিক উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাপনা প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু কৃষি সমবায় সমিতি এবং মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করেন। তিনি তাঁতি সমবায় সমিতি ও শিল্প সমবায় সমিতি গড়ে তোলেন। আজ বাংলাদেশের অন্যতম সমবায়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান মিল্ক ভিটা জাতির পিতার হাতেই গড়া।

১৯৭২ সালে প্রণীত দেশের সংবিধানে সমবায় মালিকানাকে দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু দেশের ৬৫ হাজার গ্রামে একটি করে সমবায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এর সদস্য হতো গ্রামের সব মানুষ। তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যৌথ কৃষি খামার। সরকার তাতে ঋণ দেবে, উপকরণ সহায়তা দেবে, সেচের ব্যবস্থা করে দেবে। তাতে কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়বে। তার সুফল পাবে জমির মালিক, শ্রম প্রদানকারী ভূমিহীন কৃষক ও সরকার। তবে জমির মালিকানা কৃষকেরই থাকবে।

নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সমবায় নারীর অর্থনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারীর গ্রুপভিত্তিক কার্যক্রম তাদের সফলতার পথ প্রশস্ত করে ও নেতৃত্ব তৈরি করে।

সমবায়ের একটি বড়ো অংশ কৃষি সমবায়ের সঙ্গে জড়িত। তারা কৃষি পণ্যের উৎপাদন করছে, মধ্যস্বত্বভোগীদের নাগপাশ এড়িয়ে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করছে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে তারা উন্নত বীজ, সার, সেচ ও কৃষি যন্ত্রায়ণের ব্যবস্থা করছে। এক্ষেত্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান অনস্বীকার্য। তিনিই দেশের কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে অধিক উৎপাদন ও লাভজনক বিপণনে উৎসাহিত করেছেন।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রেরণায় সমবায় কর্মসূচি পুনরায় গতি লাভ করেছে। দেশে সমবায় সমিতির সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া বর্তমান সরকার ডিজিটাল সমবায় অধিদপ্তরের সদর কার্যালয় থেকে উপজেলা পর্যন্ত সকল কার্যালয়কে আইসিটি নেটওয়ার্কের আওতায় এনে অনলাইনে সমবায় পণ্য কেনাবেচার ব্যবস্থা করেছে।

গত এক দশকে বছরে দেশে কৃষির উৎপাদন প্রায় ৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে দুধ, ডিম, মাংস ও মাছের উৎপাদন। বর্তমানে বাংলাদেশ প্রায় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ধানের উৎপাদন বেড়েছে প্রতি হেক্টরে ১ টন থেকে ৩ টন। উচ্চফলনশীল জাত সম্প্রসারিত হয়েছে শতকরা প্রায় ৯০ শতাংশ জমিতে। সেচ এলাকা বিস্তার লাভ করেছে ৭৪ শতাংশ ফসলি এলাকায়। এতে সমবায়ের প্রভাব রয়েছে। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য আমাদের কৃষির উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বাড়াতে হবে। বিভিন্ন কৃষি পণ্যের আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনার মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। এর জন্য সমবায় আন্দোলনকে আরও জোরদার করা দরকার।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের জনপ্রতি আয় ছিল ১০০ মার্কিন ডলারের নীচে। অর্ধশতাব্দী পর এখন তা উন্নীত হয়েছে ২৭৯৩ মার্কিন ডলারে (০৫.০২.২০২৩ বিবিএস)। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গত ১৩ বছর ধরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে গড়ে প্রায় ৭ শতাংশ হারে। ১৯৭২ সালে আমাদের দারিদ্র্যের হার ছিল ৮০ শতাংশ। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশের কাতারে এসে স্থান করে নিয়েছে। সমবায়ের মাধ্যমে আয় বৈষম্য দূর করে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এক্ষেত্রে আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়নের প্রতি সমবায়কে কাজে লাগাতে হবে।

বর্তমানে মানুষে মানুষে বৈষম্য বিরাজমান। বৈষম্য রয়েছে গ্রাম ও শহরের জীবন ধারায়। এগুলো দূর করতে হবে। এর জন্য দরকার গ্রামীণ অর্থনীতিকে বহুমুখী করা, কর্মসংস্থান বাড়ানো, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী জোরদার করা, পুঁজি গঠন ও আয়বর্ধক কর্মসূচি গ্রহণ করা, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করা, বাসস্থানের পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রধান অবলম্বন সমবায়। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন নিশ্চিত করার একটি কৌশল হচ্ছে সমবায়। মানবিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের নির্ভরযোগ্য একটি অবলম্বন সমবায়। এটি সততা প্রতিষ্ঠা এবং মনন ও মানসিকতা পরিবর্তনের উত্তম পন্থা। সমবায় সুপ্রতিষ্ঠিত হলেই সুশাসন, গণতন্ত্রায়ন, বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রান্তিক জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা যাবে। এর জন্য দেশে সমবায় আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষায়– 'দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সমবায় একটি পরীক্ষিত কৌশল।' এ কারণেই নারীদেরকে বেশি পরিমাণে সমবায় কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশে স্মার্ট সমবায়ী নারী উদ্যোক্তা তৈরি করতে হবে। তবেই টেকসই উন্নয়ন সম্ভব।

হাছিনা আক্তার: পরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, akterhasina90@gmail.com

বাংলা সাহিত্য ও বর্ষা ঋতু

জায়েদুল আলম

বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। ষড়ঋতুর প্রকৃতি তার বিচিত্র স্বভাবের অভিব্যক্তি ঘটিয়ে শিল্পরসিক মানুষকে অভিভূত করে। ঋতু পরিবর্তিত চিরায়ত ধারায় আষাঢ়-শ্রাবণ এই দুই মাস আমাদের বর্ষাকাল। বর্ষাকালে আকাশ থাকে গুরুগম্ভীর কালো মেঘের ভারে নিরন্তর অবনত। মেঘ বর্ষণের বিপুল দাপট চলে এই সময়।

বাংলা সাহিত্যে ষড়ঋতুর প্রভাব ও প্রতিপত্তি বহুদূর-সঞ্চারী। বাংলা কবিতায় এই বর্ষাঋতুর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। বর্ষার চরিত্র বা সৌন্দর্যের যে বৈচিত্র্যতা তা অন্য পাঁচটি ঋতু থেকে স্বতন্ত্র। এই স্বতন্ত্র বর্ষা ঋতুকে নিয়ে কবিদের কবিতায় বর্ষার রূপ বা সৌন্দর্য ধরা দিয়েছে নানান অভিপ্রায়ে। বর্ষার রূপবৈচিত্র্যতা বা সৌন্দর্যবোধ নানাভাবে কবিরা তাদের কবিতায় ব্যক্ত করেছেন ।

বর্ষা ঘিরে এ সুধা রচনার আনন্দ থেকে ফিরে থাকতে পারেননি আদিযুগ থেকে মধ্যযুগ, মধ্যযুগ থেকে আধুনিক, আধুনিক থেকে বর্তমান সময়ের কোনো কবিই। সব যুগে সব সময়ে বর্ষা তার অপরূপ রূপের ছবি চিত্রিত করেছে সকল প্রেমিক কবির মনে।

আমাদের বাংলা কাব্যসাহিত্যে মধ্যযুগের অনেক কবির কবিতায় বর্ষার বর্ণনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে কবি কালীদাস, জয়দেবের কবিতায় বর্ষার সন্ধান মেলে। তাছাড়া কবি চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে*, কবি বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাস, রায়শেখর, মনোহর দাস, বাসুদেব ঘোষ এদের প্রত্যেকের বৈষ্ণব পদাবলিতেও বর্ষার বর্ণনা রয়েছে। যেখানে দেখা যায় যে, তাঁরা প্রত্যেকেই রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের যে অনুরাগ সেই অনুরাগের গভীরতাকে প্রকাশ করেছেন বর্ষার বিভিন্ন রূপবৈচিত্র্যের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে। এছাড়াও মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, খনার বচন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী, অক্ষয়কুমার বড়াল প্রমুখের কবিতায় বর্ষার সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের হাত ধরেই বাংলা কবিতায় বর্ষার বিচিত্র রূপ বা সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে।

কবিদের বেলায় শুধু নয়, বর্ষার আবেদন আমাদের জীবনেও নানামুখী। যে আবেদন আমাদের মধ্যযুগের বাংলা কবিতা ও সমসাময়িক কবিদের কবিতায় অনুরণিত। তারা তাই বর্ষাকে কবিতার, কবিতাকে বর্ষার পরিপূরক করে তুলেছেন, তাদের কবিতার বিভিন্ন কাব্যিক ব্যঞ্জনা অনুপ্রাস ও দ্যোতনায়। বর্ষা এলেই মানুষ ভালোবাসার অজানিত এক আহ্বানে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। তাই অনেকেই বর্ষাকে ভালোবাসার ঋতু হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন। কেউ কেউ আবার বলেন, বর্ষা নয়, বসন্তই হলো প্রেমের ঋতু। তবে এ বিতর্কে শামিল না হয়ে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় বর্ষাকেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাববাদী মানুষ প্রেমের ঋতু হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন।

কেননা, এ ঋতুতেই প্রকৃতিতে লাস্যময়তার সাথে সাথে মানব মনেও প্রেমের জোয়ার আনে। সেই জোয়ারে ভাসতে ভাসতেই কবিরা তাদের বিভিন্ন কবিতায় প্রকাশ করে থাকেন প্রেমের বিবিধ ব্যাকুলতা। তাই বর্ষা কখনও অবিমিশ্র প্রেমের অনুঘটক, কখনও কামনা-বাসনা আকুলতার সরব ভাষা হয়ে দাঁড়ায়। সে জন্যেই কবিতায় বর্ষা ধরা দেয় পূর্ণাঙ্গ ব্যপ্তিতে, বিভিন্ন ব্যঞ্জনা ও গূঢ়ার্থে।

কবি কালীদাস বর্ষাকে অনুভব করেছেন অনুরাগের গভীরতায়। কালীদাসের দৃষ্টিতে বর্ষার সৌন্দর্য-সখা যে মেঘ, সেই মেঘকে কবি লোভনীয় সম্ভোগের আভাস দিয়ে যক্ষের সহচর রূপে যক্ষ প্রেমিকার কাছে পাঠান। সেখানে মেঘ সঙ্গত কারণেই প্রেমের বার্তাবহ দূত রূপে চিহ্নিত হয়। মেঘের সঙ্গে প্রেম আর বিরহের একটা অনড় সম্বন্ধ পাতিয়ে কালীদাস তাঁর কবিতায় এক অনবদ্য চিত্রকল্প তৈরি করেছেন। কালীদাসের কবিতার অনুবাদের কিছু অংশ যেমন–

> কেমনে প্রিয়তমা রাখবে প্রাণ তার অদূরে উদ্যত শ্রাবণে
> যদি-না জলধরে বাহন করে আমি পাঠাই মঙ্গলবার্তা?
> যক্ষ অতএব কুড়চি ফুল দিয়ে সাজিয়ে প্রণয়ের অর্ঘ্য
> স্বাগত-স্বভাষ জানালে মেঘবরে মোহন, প্রীতিময় বচনে।

এভাবেই কালীদাসের ‘মেঘদূত’ কবিতায় রামগিরি পর্বতের ওপারে নির্বাসিত শূন্য ও একাকিত্ব জীবনে মেঘ যখন উঁচু গিরির উপর দিয়ে ডানা মেলে উড়ে যেত, তখন বিরহী যক্ষের মনে জাগত প্রিয়া বিরহের যাতনা। তাই তিনি বিশদ ব্যাকুলতা বর্ণনা করে মেঘকে দূত করে পাঠাতেন প্রিয়ার কাছে।

মধ্যযুগের কবিতায় বর্ষা এসেছে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের ইন্দ্র হিসেবে। মধ্যযুগের কবিরা বর্ষাকে অভিসার ও বিরহ পর্বে প্রেমবহ্নিতে ঘৃতের ছিটার হিসেবে কল্পনা করেছেন। একই ধারায় চণ্ডীদাস তাঁর প্রেম বিরহ কাতরতার কথা প্রকাশ করেন তাঁর কবিতায়–

> এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা/ কেমনে আইল বাটে
> আঙ্গিনার মাঝে বধূয়া ভিজিছে/ দেখিয়া পরাণ ফাটে।

আর বিদ্যাপতির রচনায়ও বর্ষার বিরহ কাতরতা কম নয়–

> এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর
> এ ভরা ভাদর মাহ বাদর
> শূন্য মন্দির মোর।

আর মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতায় দেখা যায়, তিনি বর্ষাকে কল্পনা করেছেন প্রকৃতির অরূপ শক্তি হিসেবে। তাঁর কবিতায় বর্ষার প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। যার সাথে একাত্ম ঘোষণা করেছেন দেবতাগণও। মধুসূদন দত্তের ‘বর্ষাকাল’ কবিতায় বর্ষার রূপকল্প বর্ণনা হয়েছে এভাবে–

গভীর গর্জন করে সদা জলধর
উথলিল নদ-নদী ধরণীর উপর
রমনী রমন লয়ে
সুখে কেলি করে
দানবাদি দেব যক্ষ সুখিত অন্দরে।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম নারী ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবী। তিনিও বর্ষা নিয়ে কবিতা লিখেছেন। বর্ষার চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রাবণ মাসকে দেখেছেন ঘনঘোর বর্ষণের মাস হিসেবে। তাঁর দৃষ্টিতে বর্ষা-চরিত্রের ভাবটি তিনি তুলে ধরেছেন এভাবে–

সখি, নব শ্রাবণ মাস
জলদ-ঘনঘটা, দিবসে সাঁঝছটা
ঝুপ ঝুপ ঝরিছে আকাশ!
ঝিমকি ঝম ঝম, নিনাদ মনোরম,
মুহুর্মুহু দামিনী-আভাস! পবনে বহে মাতি,
তুহিন-কণাভাতি দিকে দিকে রজত উচ্ছ্বাস।

বর্ষার আরেক কবি অক্ষয়কুমার বড়াল। তিনি কবিতায় বর্ষার গ্রামবাংলার প্রকৃতির বর্ণনা তুলে ধরেছেন। যেখানে কবি স্বভাবের সৌন্দর্য প্রকৃতির মতোই সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত। কবিতাটির কয়েকটি লাইন–

দীঘিটি গিয়াছে ভরে, সিঁড়িটি গিয়াছে ডুবে,
কানায় কানায় কাঁপে জল;
বৃষ্টি-ভরে বায়ু-ভরে নুয়ে পড়ে বারে বারে
আধফোটা কুমুদ কমল।

মধ্যযুগের কবিতায় কবিদের বর্ষা নিয়ে ভাবনার পর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সময়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতায়ও বর্ষার বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ হতে দেখা যায়। কেননা রবীন্দ্রনাথের কাছে বর্ষা ছিল ষড়ঋতুর মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ঋতু।

বর্ষার ঘনকালো মেঘ আকাশকে ঢেকে দিয়ে গুরু গুরু গর্জনে যখন নেমে আসে বৃষ্টির অবিরাম ধারা; সে বৃষ্টির ধারা তাঁকে হাত ধরে নিয়ে যায় শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিময় দিনগুলোতে। তাই তাঁর কবিতার শরীরে চোখ বুলালে জেগে ওঠে প্রেমের উদ্রেক। রবীন্দ্রনাথের বহু জনপ্রিয় কবিতার মধ্যে অন্যতম বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর যা বর্ষার দিনে কবিমনকে সিক্ত করে অতীত রোমন্থনে। তাই বুঝি বৃষ্টি এলেই দুরন্ত শৈশব তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, আর কবি আক্রান্ত হন নস্টালজিয়ায়; তখনই তাঁর কবিতায় ঝরে পড়ে স্মৃতিকাতরতার বৃষ্টি–

কবে বৃষ্টি পড়েছিল, বান এলো যে কোথা
শিব ঠাকুরের বিয়ে হলো কবেকার সে কথা।
সে দিনও কি এমনিতরো মেঘের ঘটাখানা
থেকে থেকে বাজ বিজুলি দিচ্ছিল কি হানা।

রবীন্দ্রনাথ মূলত বর্ষাকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছেন পূর্ববঙ্গে এসে ১৮৯১ থেকে ১৯০১ সালে জমিদারি দেখাশোনা করার সময়। বর্ষার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের মানবজীবনের চিরন্তন বিরহ-বেদনা অনুভব করেছেন। তাই দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের কাছে বর্ষা কখনও নবযৌবনের প্রতীক, কখনও বিরহকাতর হৃদয়ের দহন-জ্বালার প্রকাশ হিসেবে ধরা দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বর্ষাকে বিশেষ শিল্পদৃষ্টিতে উপলব্ধি করেছেন যা তাঁর 'বর্ষামঙ্গল' কবিতায় সেই কাব্যভাবনার প্রকাশ দেখা যায়। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের হৃদয়জুড়ে বর্ষা যে একটি আসন প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে একথা বলা যায়। কবি বর্ষার আগমনে পুলকিত হয়ে আনন্দের নির্যাসটুকু প্রকৃতির মধ্যে ঢেলে দিয়ে বর্ষাকে অভিবাদন করেছেন–

এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা–
দুলিছে পবন সনসন বনবীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা।

আমাদের বিদ্রোহী কবি একইসাথে প্রেমের কবি কাজী নজরুল ইসলাম। প্রকৃতির নানামুখী ব্যঞ্জনায় নিজেকে সন্ধান করেছেন। কবিত্বের শিল্পসুন্দর মাধুর্য কবির কাব্যানুভূতি উৎসারিত হয়েছে। নজরুল অন্যান্য কবিদের মতো তাঁর শিল্পচৈতন্যেও বর্ষাঋতুর প্রভাবকে উপস্থাপন করেছেন। নজরুল যে অনন্ত বিরহের কবি, তা তাঁর বর্ষার বর্ণনার মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুটিত হয়েছে। বর্ষার সম্মোহন রূপের প্রভাবে মানব-হৃদয়ে প্রিয়সঙ্গহীনতার বেদনা ঘনীভূত হয়, সেই দিকটি তিনি তাঁর কবিতায় তুলে ধরেছেন। কবিতার কয়েকটি লাইন–

অঝোর ধারায় বর্ষা ঝরে সঘন তিমির রাতে।
নিদ্রা নাহি তোমার চাহি আমার নয়ন-পাতে।।
ভেজা মাটির গন্ধ সনে/ তোমার স্মৃতি আনে মনে,
বাদলী হাওয়ায় লুটিয়ে কাঁদে আঁধার আঙিনাতে।

পল্লিকবি জসীমউদ্দীন। তিনিও বর্ষা নিয়ে অনবদ্য কবিতা সৃষ্টি করেছেন। তাঁর অনবদ্য কবিতা– 'পল্লি-বর্ষা'। কবিতায় বর্ষা এসেছে আরেক রকম ব্যঞ্জনা হয়ে। তিনি উদাস হয়ে দেখেছেন বর্ষার রূপ। 'পল্লি-বর্ষা' কবিতায় কবি বর্ষার অবিশ্রান্ত বর্ষণমুখর গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে যে আড্ডার আসর বসে, ফাঁকে ফাঁকে পল্লি বাংলার শ্রমজীবী মানুষের অসমাপ্ত কাজগুলোও যে আড্ডার ছলে সারা হয়ে যায় সেই কিচ্ছা- কাহিনি শোনার যে লোকায়ত চিত্র তা তুলে ধরা হয়েছে উক্ত কবিতায়–

গাঁয়ের চাষীরা মিলিয়াছে আসি মোড়লের দলিজায়
গল্প গানে কি জাগাইতে চাহে আজিকার দিনটায়!
কেউ বসে বসে কাখারী চাঁচিছে, কেউ পাকাইছে রশি;
কেউ বা নতুন দোয়াড়ীর গায়ে চাকা বাঁধে কষি কষি।
মাঝখানে বসে গাঁয়ের বৃদ্ধ, করুণ ভাটীর সুরে
আমির সাধুর কাহিনী কহিছে সারাটি দলিজা জুড়ে।
বাহিরে নাচিছে ঝর ঝর জল, গুরু মেঘ ডাকে,
এসবের মাঝে রূপ-কথা যেন আর রূপ আঁকে।

রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-জসীমউদ্দীনের পরবর্তী সময়ের কবিরাও বর্ষা নিয়ে কবিতা লিখেছেন। তাঁদের মধ্যে কবি জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাধ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু এদের কবিতায় বর্ষার কথা উঠে এসেছে। প্রকৃতির যে কত রূপ আর ঐশ্বর্য ছড়িয়ে রয়েছে তার কোনো হিসেব নেই।

রূপসী বাংলার কবি কবি জীবনানন্দ দাশ। প্রকৃতির সেই রূপের ভেতর দিয়েই তাঁর কবিতায় বিভিন্ন ঋতুর চরিত্র অঙ্কন করেছেন। 'এ জল ভালো লাগে' কবিতায় কবি বলেছেন–

এই জল ভালো লাগে; বৃষ্টির রূপালি জল কত দিন এসে
ধুয়েছে আমার দেহ- বুলায়ে দিয়েছে চুল- চোখের উপরে
তার শান-স্নিগ্ধ হাত রেখে কত খেলিয়াছে, আবেগের ভরে
ঠোঁটে এসে চুমো দিয়ে চলে গেছে কুমারীর মতো ভালোবেসে;
এই জল ভালো লাগে; নীলপাতা মৃদু ঘাস রৌদ্রের দেশে
ফিঙ্গা যেমন তার দিনগুলো ভালোবাসে- বনের ভিতর
বার বার উড়ে যায়, তেমনি গোপন প্রেমে এই জল ঝরে
আমার দেহের পরে আমার চোখের পরে ধানের আবেশে...

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর কবিতায় ষড়ঋতুর বিচিত্র বিকাশকে রূপ দিয়েছেন গতানুগতিক কোনো ঋতু-বন্দনার ধারায় নয়, দিয়েছেন নিজস্ব শিল্পকৌশল আর দার্শনিক ভাবনার মধ্যে দিয়ে এবং জীবনের কোনো বিরুদ্ধ অনুষঙ্গের মুখোমুখির কারণে তিনি ব্যবহার করেছেন ঋতু বৈচিত্র্যতাকে। বর্ষা নিয়ে তাঁর কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– 'বর্ষার দিনে' ও 'শ্রাবণবন্যা' কবিতা দুটি। 'শ্রাবণবন্যা' কবিতাটির কয়েকটি লাইন কবির শিল্পশৈলীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত–

> সংকীর্ণ দিগন্তচক্র, অবলুপ্ত নিকট গগনে
> পরিব্যাপ্ত পাংশুল সমতা;
> অবিশ্রান্ত অবিরল বক্র ধারা ঝরিছে সঘনে;
> হাঁকে বজ্র বিস্মৃতমমতা;
> প্লাবিত পথের পাশে আনত বঙ্কিম তরুবীথি
> শিহরিছে প্রমত্ত ঝঞ্ঝায়;
> কাল আজি সংজ্ঞাহারা; নিমজ্জিত প্রহরের বৃতি;
> ভেদ নাই ঊষায় সন্ধ্যায়।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সমসাময়িক আরেক কবি অমিয় চক্রবর্তী। তিনিও বর্ষার বৃষ্টিবিধৌত প্রকৃতির তরঙ্গ-হিল্লোলিত স্বভাবের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বর্ষা নিয়ে কবিতা লিখেছেন। বর্ষা নিয়ে অমিয় চক্রবর্তীর একটি কবিতা–

> অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে।
> ধানের খেতের কাঁচা মাটি, গ্রামের বুকের কাঁচা বাটে,
> বৃষ্টি ঝরে মধ্যদিনে অবিরল বর্ষাধারাজলে।
> যাই ভিজে ঘাসে ঘাসে বাগানের নিবিড় পল্লবে
> স্তম্ভিত দীঘির জলে, স্তরে স্তরে, আকাশে মাটিতে।
> অন্ধকার বর্ষাদিনে ঝরে জলের নির্ঝরে।

আধুনিক কবিদের মধ্যে আধুনিক শিল্পভাবনার অন্যতম বিশিষ্ট কবি বুদ্ধদেব বসু। ষড়ঋতু নিয়ে বুদ্ধদেব বসু অনেক কবিতা লিখেছেন। এর মধ্যে বর্ষা নিয়েও তিনি কবিতা লিখেছেন। বর্ষা নিয়ে তিনি বাংলাদেশ এবং কোলকাতার বর্ষার রূপবৈচিত্র্যতার নির্মম বাস্তবতা নিয়ে বর্ষাকালীন অবস্থার চিত্রপট তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায়। এছাড়াও তিনি বর্ষায় একটানা যে বৃষ্টিপাত হয় মর্তভূমে যখন ধূসরতা নামে, ভিজে হাওয়ার শীতল পরিবেশ তৈরি হয় এবং ব্যাঙের যে অবিরাম ডাক শুরু হয় সেই ডাক ব্যতিক্রমী ধারায় বর্ষার চরিত্রের মধ্যে দিয়ে বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতায় তুলে ধরেছেন। এমনই একটি কবিতার কিছু অংশ বিশেষ এরূপ–

> বর্ষায় ব্যাঙের ফূর্তি। বৃষ্টি শেষ, আকাশ নির্বাক;
> উচ্চকিত ঐক্যতানে শোনা গেলো ব্যাঙেদের ডাক।
> একটি অক্লান্ত সুর; নিগূঢ় মন্ত্রের শেষ শ্লোক–
> নিঃসঙ্গ ব্যাঙের কণ্ঠে উৎসারিত– ক্রোক, ক্রোক, ক্রোক।

পরবর্তীতে বিভিন্ন দশকের বিভিন্ন কবিগণ বর্ষা নিয়ে কবিতা লিখেছেন। মুসলিম রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদ অধঃপতিত মুসলিমসমাজের পুনর্জাগরণের অনুপ্রেরণায় ইসলামি ভাবধারার বাহক হলেও তাঁর কবিতায়ও বর্ষার দোল লেগেছে। বৃষ্টির ছন্দ তাঁকে নাচিয়েছে। মনে আনন্দের ঢেউ খেলিয়েছে। তিনি আনন্দে তবলার ছন্দের মতো বৃষ্টির গানে গেঁথেছেন:

> বৃষ্টি এলো কাশবনে
> জাগলো সাড়া ঘাসবনে
> বকের সারি কোথায় রে
> লুকিয়ে গেলো বাঁশবনে।

এদিকে কবি শামসুর রাহমানের কবিতায় শুধু যুদ্ধ, স্বাধীনতা, বিজয়, প্রেমই আসেনি, বর্ষাও এসেছে। তাঁর মানসপটে রাইফেল, বেয়নেট, জলপাই রঙের ট্যাংকই খেলা করেনি কেবল, কবিকেও বুদ করেছে বৃষ্টি। বৃষ্টির জন্য কবি অপেক্ষায় থেকেছেন যেমন মানবহৃদয় অপেক্ষায় থাকে প্রেমিকার জন্য। বর্ষাকে কবি দেখতে চেয়েছেন সবকিছু ছেড়ে ভালোলাগার স্পর্শ করে। তাই তো চাষির মতোই তিনিও বর্ষাকে প্রার্থনা করেছেন–

> টেবিলে রয়েছি ঝুঁকে, আমিও চাষীর মতো বড়
> ব্যগ্র হয়ে চেয়ে আছি খাতার পাতায়, যদি জড়ো
> হয় মেঘ, যদি ঝরে ফুল, বৃষ্টি। অলস পেন্সিল
> হাতে, বকমার্কা। পাতা জোড়া আকাশের খাঁ খাঁ নীল।
> (কবিতা : অনাবৃষ্টি)

তেমনিভাবে আল মাহমুদ, সৈয়দ শামসুল হক, নির্মলেন্দু গুণসহ বাংলাদেশের সমকালীন কবিদের কবিতায় বর্ষা বন্দনা ফুটে উঠেছে।

কবি আল মাহমুদ বর্ষাকে দেখেছেন অন্য এক দৃষ্টিতে। তাঁর কবিতায় বর্ষা-প্রকৃতি অন্যমাত্রার এক কথা বলে। 'আষাঢ়ের রাত্রে' কবিতায় তিনি ব্যক্ত করেছেন–

> শুধু দিগন্ত বিস্তৃত বৃষ্টি ঝরে যায়, শেওলা পিছল
> আমাদের গরিয়ান গ্রহটির গায় ।

কবি রফিক আজাদ তাঁর বর্ষা নিয়ে 'ময়ূর আনন্দে মাতো' কবিতাটিতে বর্ষার আহ্বান করেছেন। যেখানে দেখা যায় মানুষের মেধায়-মননে প্রকৃতির ন্যায় বর্ষার রূপ পূণ্যতা দিতে বর্ষার অপার যে আনন্দ সেই আনন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। তাছাড়া প্রতিটি ঋতুই কল্যাণময়। বর্ষাকালের বৃষ্টির কল্যাণে ভূমি উর্বর হয়ে ওঠে। কৃষিভূমি উর্বর হয়ে ওঠার ফলে ফসলাদি ভালো হয় যার কারণে আমাদের মতো কৃষিনির্ভর দেশে বর্ষাকে কল্যাণময় হিসেবে দেখেছেন কবি রফিক আজাদ। নীচে তাঁর উক্ত কবিতাটির কয়েকটি লাইন উল্লেখ করা হলো–

> বর্ষায় বর্ষণ চাই মননে-মেধায়
> শস্যের প্রান্তরে আর প্রতি ঘরে ঘরে, জীবনে-জীবন চাই
> যুগলে-যুগলে
> বর্ষার ধারাপাত অপার বর্ষণে এই মাঙ্গলিক ময়ূর-আনন্দে
> মাতো কৃষিসভ্যতার সকল সন্তান।

কবি নির্মলেন্দু গুণ। তিনিও বর্ষার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কবিতার মধ্যে দিয়ে বর্ষার সাথে তাঁর এক মধুর সম্পর্কের বয়ান উল্লেখ করেছেন, যা অভিনব। বর্ষাকে সে ঋতুদের মধ্যে বর্ষা রানি বলে আখ্যায়িত করেছেন। বর্ষাকে সে দেখেছেন জীবনের নতুন যৌবন আর প্রকৃতির ভেতর দিয়ে। তেমনিভাবে সে বর্ষাকে তাঁর জীবনের যৌবনসঙ্গী হিসেবে দেখার প্রয়াস ঘটিয়েছেন। তাই তিনি অনায়াসে উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন–

> ভাগ্য ভালো, মনুষ্য-বিবাহপ্রথা বর্ষা জানে না।
> সে ভালোবাসে উন্মুক্ত বিহার, গগনে গরজে,
> তবে সিঁধুরে মেঘের প্রতি তার টান আছে,
> তাই আমি তাকে পরিয়েছি বজ্রচেরা মেঘের সিঁধুর।

সৈয়দ শামসুল হক বর্ষার বৃষ্টিকে পবিত্র এক জলফোয়ারা রূপে দেখেছেন। বৃষ্টিতে ধৌত হলে পৃথিবীর আর কোনো জলে ধৌত হওয়ার প্রয়োজন নেই বলেই বর্ষার এ বৃষ্টিতে ভেজা ঘরে প্রাণের স্বদেশকে স্বাগত জানিয়েছেন।

তোমাকে অভিবাদন বাংলাদেশ,
তুমি ফিরে এসেছ তোমার বৃষ্টিভেজা খড়ের কুটিরে
যার ছায়ায় কত দীর্ঘ অপেক্ষায় আছে সন্তান এবং স্বপ্ন
(কবিতা: তোমাকে অভিবাদন বাংলাদেশ)

হুমায়ূন আহমেদের বর্ষা লোভের কথা কে না জানে। সমুদ্রের কাছে গেলে এই গীতকবি যেমন হুলুস্থুল মার্কা পাগল হয়ে যেতেন, তেমন মাতাল হয়ে যেতেন বর্ষার বৃষ্টি দেখে। আকাশ ডাক দিয়ে বৃষ্টি নামতে দেরি হতো– বাড়ির উঠোনে নামতে দেরি হতো না বিন্দু মাত্র তাঁর। যে প্রিয়াকে ভালোবাসতেন প্রাণাধিক সে প্রিয়তমাকে তাই তিনি অন্য কোনো ঋতুতে নয়, বর্ষা ঋতুতেই আসতে বলেছেন, যদি তাঁকে মনে পড়ে–

যদি মন কাঁদে
তুমি চলে এসো, চলে এসো
এক বরষায়।
এসো ঝর ঝর বৃষ্টিতে
জল ভরা দৃষ্টিতে
এসো কোমল শ্যামল ছায়।
(গীতকবিতা: যদি মন কাঁদে)

কবি মহাদেব সাহা– তিনিও বর্ষা নিয়ে বেশ কয়েকটি কবিতা লিখেছেন। তাঁর কাছে তো বর্ষা হচ্ছে জীবনের প্রথম আনন্দ। তিনি বর্ষাকে তাঁর জন্ম ঋতু হিসেবে কবিতায় আখ্যায়িত করেছেন। তাই তিনি বর্ষাকে কীভাবে জীবনে উপলব্ধি করেছেন সেটিও তিনি তাঁর বর্ষা নিয়ে লেখা 'বর্ষ' কবিতাটিতে তুলে ধরেছেন–

বর্ষা হচ্ছে জীবনের প্রথম আনন্দ,
আজো আমি বর্ষায় উন্মাদ
আজো আমি বর্ষামত্ত ঘোরলাগা পল্লীর বালক
বর্ষায় আবার আমি ফিরে পাই ত্বক ও জিহ্বার স্বাদ।

বৃষ্টিকে আনন্দ বা বেদনার রূপে না দেখে কবি অসীম সাহা দেখেছেন করুণ রূপে। ভয়ের চোখে তাকিয়েছেন বর্ষার এই ধারার দিকে। প্রিয় নারী মাধবীকে তাই বারণ করা– যেন ঝরঝর দিনে বাহিরে না বেরোয়। মাধবীর জন্য কবির মনে কান্না– বর্ষার রূপ, বৃষ্টি কান্নার মতোই–

ঢাকার আকাশ আজ মেঘাচ্ছন্ন, মাধবী এখন তুমি বাইরে যেও না
এই করুণ বৃষ্টিতে তুমি ভিজে গেলে বড়ো ম্লান হয়ে যাবে তোমার শরীর
মাধবী বৃষ্টিতে তুমি বাইরে যেও না। মাধবী তুষারপাতে বাইরে যেও না।
(শহরে, এই বৃষ্টিতে)

বাংলা ভাষার এমন কোনো কবিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না যাকে বর্ষা ও তার ঘনকালো মেঘ মনকে আচ্ছন্ন করেনি। কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা তাঁর বৃষ্টি পড়ে কবিতার মাধ্যমে বর্ষার বৃষ্টিকে নানা আঙ্গিকে প্রকাশ করেছেন–

বৃষ্টি পড়ে, বৃষ্টি পড়ে
মনে মনে বৃষ্টি পড়ে
বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে
বনে বনে বৃষ্টি পড়ে
মনের ঘরে চরের বনে
নিখিল নিঝুম গাও গেরামে
বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে
বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে

কবি হাসান হাফিজ তাঁর বর্ষাভেজা পদাবলিতে বর্ষাকে আনন্দ-বেদনা উভয় রূপেই কল্পনা করেছেন। তিনি তাঁর কবিতায় শ্রাবণের বর্ণনা করেছেন এভাবে–

শ্রাবণে বিরহ শুধু নয়, আগুনও রয়েছে
সেই তাপে শুদ্ধ হবে অসবর্ণ মিল পিপাষা।

পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়েই উপসংহারে বলতে হয়, এক বর্ষামুখর দিনে শিলাইদহে বসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে এক চিঠিতে লিখলেন–

সমস্ত আকাশ অন্ধকার করে নিবিড় হয়ে জমে এসে বৃষ্টি আরম্ভ হলো– আমার নীচের ঘরের চারদিকে শার্সি বন্ধ করে বসে বসে 'মেঘদূত'র উপর প্রবন্ধ লিখছি। প্রবন্ধের ওপর আজকের এই নিবিড় বর্ষার দিনের বর্ষণমুখর ঘনান্ধকারটুকু যদি এঁকে রাখতে পারতুম, যদি আমার শিলাইদহের সবুজ ক্ষেতের উপরকার এই শ্যামল আবির্ভাবটিকে পাঠকদের কাছে চিরকালের জিনিস করে রাখতে পারতুম তাহলে কেমন হত! কি অনায়াসেই জল স্থল আকাশের উপর এই নির্জন মাঠের নিভৃত বর্ষার দিনটি। এই কাজকর্ম ছাড়াই মেঘে ঢাকা আষাঢ়ের রৌদ্র মধ্যাহ্নটুকু ঘনিয়ে এসেছে।

অথচ আমার লেখার মধ্যে তার কোনো চিহ্নই রাখতে পারলুম না। কেউ জানতে পারবে না কোনোদিন– কোথায় বসে বসে সুদীর্ঘ অবসরের বেলায়– লোকশূন্য বাড়ীতে এই কথাগুলো আমি আপন মনে গাঁথছিলুম।

রবীন্দ্রনাথের মতো সব যুগের সব কবির বর্ষা বিষয়ক কবিতা, বর্ষাকে বিষয় করে কবিতা, বর্ষাকে উপমা করে কবিতাই প্রকাশ করে বর্ষা ঋতু বাংলার, বাংলা ভাষার কবিদের কীভাবে প্রভাবিত করেছে। রূপে-রসে কীভাবে বিমোহিত করেছে কবির ভাবনার সৃষ্টি জগৎকে। কবির কাছে বাংলার বর্ষা ঋতু রবীন্দ্রনাথের মতো চিরকালের জিনিস হয়েই রইল যেন।

চিরকালই কবিদের বর্ষা বন্দনায় বাঙময় হয়ে উঠেছে এই বর্ষার মোহিনী রূপ। ব্যক্ত হয়েছে অনেক, অব্যক্ত রয়ে গেছে আরও বেশি। গহন বর্ষার সজল কালো মেঘবৃষ্টি ভেজা ভুঁইচাপা, কামিনি আর দোলনচাঁপার গন্ধ মনে যে অনির্বচনীয় আনন্দ সঞ্চারণ করে– ভাষার সাধ্য কি পৌছায় সেখানে! মেঘমেদুর বর্ষার রং-রূপ-রস-গন্ধ মানুষ ভালোবেসেছে অনন্তকাল। যুগে যুগে কবিরা সে ভালোবাসার চিহ্ন রেখে গেছেন তাদের কবিতায়– বর্ষা বন্দনায়।

এভাবেই পূর্ববর্তী কবিদের ধারাবাহিকতায় এখনও চলছে বর্ষার বিভিন্ন অনুষঙ্গ নিয়ে কবিদের কবিতা লেখা। এখনও প্রতি বর্ষা ঋতু এলেই বিভিন্ন ছোটো কাগজ বা দৈনিক পত্রিকার সাময়িকীগুলোতে বর্ষা নিয়ে আয়োজন করা হয়। বর্ষা নিয়ে কবিদের কবিতার প্রকাশ। এভাবেই হয়ত যুগে যুগে প্রকৃতির এই ঋতু রানি বর্ষাকে নিয়ে কবিদের ভাবের সীমা অসীম হয়ে উঠবে। কবিতার রাজ্যে বর্ষার কবিতাও তার সৌন্দর্যে ফুটে উঠবে। প্রকৃতির মতো করে বর্ষাও বারে বারে নতুন যৌবন পাবে। কবিদের হাত ধরে কবিতার এই নান্দনিক সৌন্দর্যে ভরে উঠুক আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ– এই হোক বর্ষা ঋতুর প্রতি আমাদের একান্ত প্রত্যাশা।

জায়েদুল আলম: শিক্ষাবিদ, গবেষক ও লেখক, zaidulalam@yahoo.com

বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন

প্রত্যয় জসীম

বাংলাদেশের প্রধান সম্পদ মানুষ। মানবসম্পদ উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা রাখে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা। সার্বিকভাবে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। সারা বিশ্বের মানব উন্নয়ন পরিস্থিতি সবচেয়ে ভালো নরওয়েতে, এরপর আছে যথাক্রমে আয়ারল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ড।

আয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মানব উন্নয়নের এই তিনটি সূচকই সারা বিশ্বে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বাংলাদেশও ব্যতিক্রম নয়। মানুষের আয় ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধার হলেও শিক্ষা খাতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে। সামাজিক খাতে উন্নয়ন সত্ত্বেও বাংলাদেশে আয়-বৈষম্য প্রকট। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ স্বাস্থ্য, শিক্ষা খাতে ভালো করছে। যেমন গড় আয়ুর হিসাবে ভারতের চেয়ে এগিয়ে আছে। বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ৭২.৬ বছর, ভারতের গড় আয়ু ৬৯.৭ বছর।

বাংলাদেশে প্রতি এক লাখ জীবিত শিশু জন্মগ্রহণকালে ১৭৩ জন মা মারা যায়। বাংলাদেশের ২৫ বছর ও এর বেশি বয়সি নারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৩৯.৮ শতাংশ কমপক্ষে মাধ্যমিক পাস। আর পুরুষদের মধ্যে এই হার ৪৭.৫ শতাংশ। শ্রমশক্তিতেও নারীর অংশগ্রহণ বেড়ে ৩৬.৩ শতাংশ হয়েছে। প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ খুব তাড়াতাড়ি অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। একজন সুস্থকর্মী স্বাস্থ্যহীন বা রোগাকর্মীদের চেয়ে বেশি উৎপাদনশীল বলে স্বাস্থ্য খাতে খরচকে শিক্ষা খাতের চেয়ে প্রত্যক্ষ অবদানকারী হিসেবে দেখা হয়। তাই মানবসম্পদ উন্নয়নের বিচারে স্বাস্থ্যকে শিক্ষার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন যুবসমাজের আইকন। তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যুবরাই জাতির প্রাণশক্তি, উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান নিয়ামক। শুধু তাই নয় যুবরা সাহসী, বেগবান, প্রতিশ্রুতিশীল, সম্ভাবনাময় এবং সৃজনশীল। এরই ধারাবাহিকতায় যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং কৃষিভিত্তিক বহুমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার।

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশে পরিণত করার লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন শুরু করেছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজন বিদ্যমান জনশক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বহুমুখী শ্রমের চাহিদা পূরণ করা, প্রযুক্তির পরিবর্তনে কর্ম-সংকোচনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীদের পুনঃপ্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মোপযোগী করা। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যাপক সংখ্যক দক্ষ জনবলের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও তাদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা।

কোভিড-১৯-এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে নানারকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিবিএসের সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-২০১৭ অনুযায়ী দেশে ১৫ বছরের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম শ্রমশক্তি ৬.৩৫ কোটি। এই বিপুল কর্মক্ষম জনসম্পদকে কাজে লাগিয়ে উন্নত দেশ গঠনে সরকার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এ প্রেক্ষাপটে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে কাজ করছে। ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে।

মানব উন্নয়ন ২০২০ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৩৩তম। দক্ষিণ এশিয়ায় মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের উপরে আছে শ্রীলঙ্কা (৭২), মালদ্বীপ (৯৫), ভূটান (১২৯) ও ভারত (১৩১)। এক বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশ দুই ধাপ এগিয়েছে। ভারত ও পাকিস্তান এবার দুই ধাপ করে পিছিয়েছে।

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক খাতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের ২৪.৯৩ শতাংশ, যা ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ছিল ২৩.৭৫ শতাংশ। এ অর্থ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহ যেমন- শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি খাতে ব্যয় করা হচ্ছে। মানবসম্পদ উন্নয়নের মূলভিত্তি হিসেবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। তাই এ দুই খাতকে গুরুত্ব

দিয়ে জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে সরকার প্রতিবছর পর্যাপ্ত অর্থবরাদ্দ দিচ্ছে। এর ফলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বাস্তবসম্মত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

শিক্ষার মানোন্নয়নকে আরও বেগবান করার লক্ষ্যে আধুনিক ও বিজ্ঞানমুখী শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। সরকার ইতঃপূর্বে রূপকল্প–২০২১ এবং আধুনিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ হিসেবে পরিচিত। এ শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হলো– মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়নে ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। এরই ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা বিশেষত চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে বিবেচনা করে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষা কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তি এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসব পদক্ষেপের উল্লেখযোগ্য হলো– চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষার ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ব্লেন্ডেড লার্নিং পদ্ধতিতে প্রথাগত শ্রেণিকক্ষ কার্যক্রমের সঙ্গে প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল মিডিয়াকে একীভূত করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতায় নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনলাইন এন্ট্রিকরণের কাজ চলমান রয়েছে। মাঠ পর্যায়ের দপ্তর ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম অ্যাপের মাধ্যমে পরিদর্শন করা হচ্ছে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রস্তুতি হিসেবে কারিগরি শিক্ষাকে মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে সাধারণ ধারার ৬৪০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জানুয়ারি ২০২০ সাল থেকে ভোকেশনাল কোর্স পরিচালনা করছে। পর্যায়ক্রমে মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকারের ভোকেশনাল কোর্স পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে। একইসঙ্গে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজার উপযোগী দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে মানসম্পন্ন কারিগরি শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। যেমন- অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন, ৪৯টি পলিটেকনিক ও ৬৪টি টিএসসি-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন, ইংরেজি ও গণিত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি মোট ১০ হাজার ৪৫২টি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন সরকারি প্রতিষ্ঠান ১১৯টি। কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে গত একদশকে শিক্ষার্থী ভর্তির হারে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। ২০২০ সালে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার ছিল ১৭.১৪ শতাংশ। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৫ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট শতকরা ২৫ ভাগে উন্নতির লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে পরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়ন শুরু করেছে। সরকার কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করছে। গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য আর্থিক সহায়তাসহ নানা রকম সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

দেশে দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে ১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন প্রকল্প, ৪টি বিভাগীয় শহরে (সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর) ১টি করে মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন, ২৩ জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন এবং ৪টি বিভাগে (চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর) ১টি করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

আজকের মানবসম্পদই জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত-সমৃদ্ধি ও আত্মমর্যাদাশীল সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রধান কারিগর। দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমেই ৫ কোটি যুবসমাজের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব। দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়ে তাদের সচেতন করা, আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত করা এবং কর্মসংস্থানের পথ নির্দেশনা প্রদান করার মাধ্যমে জাতি পাবে উন্নত বাংলাদেশ।

প্রত্যয় জসীম: কবি ও সব্যসাচী লেখক, *prottoejashim@gmail.com*

ভায়েরা আমার বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ২০০ বক্তৃতা সংবলিত *ভায়েরা আমার* বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ১২ই জুন মন্ত্রিসভার বৈঠকের শুরুতে *ভায়েরা আমার* শিরোনামের বইটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং থেকে বলা হয়েছে, 'ভায়েরা আমার (মাই ব্রাদার্স)' নামটি প্রধানমন্ত্রী নিজেই দিয়েছেন। এছাড়া তিনি বইটির ভূমিকাও লিখেছেন। প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার নজরুল ইসলাম ভাষণগুলো সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন। জিনিয়াস পাবলিকেশন বইটি প্রকাশ করেছে।

জাতির পিতার এই ভাষণ সমগ্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এতে এখন পর্যন্ত পাওয়া সব ভাষণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বইটির ২০০ ভাষণের মধ্যে বাংলাদেশ বেতারের আর্কাইভস থেকে পাওয়া টেপ/সিডি থেকে একশোরও বেশি ভাষণ সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিটি ভাষণের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা যথাযথভাবে যাচাই করা হয়েছে। বইটিতে প্রতিটি ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হাইলাইট করে আলাদাভাবে প্রদর্শন করা হয়েছে। এছাড়া সূচিতে ভাষণের বিষয়বস্তু, সাল ও তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, জাতির পিতার ভাষণ শুধু বাংলাদেশেই নয়, সমগ্র বিশ্বে এক অমূল্য সম্পদ। বইয়ের ভূমিকায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন, নতুন প্রজন্ম বিশেষ করে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী এবং সমর্থকদের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুধু পড়াই নয়, সেগুলোর মর্মার্থ অনুধাবন করে নিজ নিজ জীবনে অনুশীলন করতে হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, জাতির পিতা সোনার বাংলা গড়তে সোনার মানুষ চেয়েছিলেন। এই সোনার মানুষ হতে হলে জাতির পিতার আদর্শ ও জীবনাচরণ চর্চা করা অত্যাবশ্যক। বইটির সম্পাদক নজরুল ইসলাম উল্লেখ করেন, ভাষণ সমগ্রটি রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থী ও আগামী প্রজন্মের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে।

প্রতিবেদন: আবিদ হোসেন

বর্ষার ফুল

শামস্ নূর

ষড়ঋতুর মধ্যে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যে বর্ষাকাল সবচেয়ে আকর্ষণীয়। বসন্তকে ঋতুরাজ বলা হলেও রূপের গৌরব ও প্রকৃতির সৌন্দর্যের জন্য বর্ষাই প্রকৃত ঋতুর রানি। বর্ষার আগমনে খালবিল যেন পানিতে ভরে ওঠে, থই থই করে চারদিক। নির্জীব প্রকৃতিতে সবুজ, সজীব আর সতেজ করার মূলমন্ত্র নিয়ে নিজের রাজত্ব চালায় বর্ষারানি। জগৎসংসার যখন তৃষ্ণাকাতর হয়, তখন প্রাণের স্পন্দন নিয়ে আসে বর্ষা। দাবদাহে যখন জনজীবন ওষ্ঠাগত, তখন বর্ষার ঝুম ঝুম বৃষ্টি স্বস্তি হয়ে নেমে আসে। নদীনালা, খালবিল ভরে ওঠে কানায় কানায়। বর্ষার মাঠে এলোমেলো বাতাসে সবুজ ধানের শিষগুলোর দুলুনি আর পানির ঢেউয়ের ছন্দমিল দৃশ্য অভিভূত করে তোলে মন। সুগন্ধি ফুলগুলো ছড়ায় সৌরভ। এ যেন জীর্ণ প্রকৃতিকে নতুন করে গড়ার এক দারুণ আয়োজন।

বৃষ্টিমুখর বর্ষাকে কেউ কেউ গ্রামীণ ঋতু বলে থাকেন। গ্রামে সে আসে আনন্দ-উচ্ছ্বাস আর প্রাণপ্রাচুর্যের উপলক্ষ হয়ে। দুরন্ত ছেলের দল বৃষ্টির পানিতে ভিজে, কাদা পানিতে খেলে ফুটবল। পুকুরের নতুন পানিতে লাফ দেওয়ার প্রতিযোগিতায় মত্ত হয় দামাল ছেলেরা। কেউবা আবার মাছ ধরতে ছুটে যায় দূরের কোনো খালবিলে।

এ সময় পল্লিবধূরা ছই নৌকায় বাপের বাড়িতে নাইয়র যায়। শাড়ির আঁচলের ফাঁকে ঘোমটা পরা রাঙামুখ ফিরে ফিরে চায় ফেলে আসা পথ পানে। পানির স্রোতের কলকল ধ্বনি আর বাতাসে পালের শব্দ। নৌকা চলতে থাকে আপন মনে। দরাজ গলায় মাঝি গেয়ে ওঠে উদাসী ভাটিয়ালি গান। কতই না আনন্দ অনুভূত হয়! রিমঝিম বৃষ্টির মিষ্টিমাখা সুরে প্রাণ ফিরে পায় প্রকৃতি। তখন যেন হেসে ওঠে সবুজ গাছপালা।

বর্ষা মানে বাহারি রঙের সুগন্ধি ফুলের সমাহার। বর্ষা যেন আমাদের প্রকৃতিকে আপন মনে বিলিয়ে দেয় এবং এর ফুলের সৌন্দর্য আমাদের করে তোলে বিমোহিত। বর্ষায় নানারকম ফুলগুলো ফুটতেও শুরু করে। বর্ষার যে ফুলগুলো আমাদের আকৃষ্ট করে তা হলো– শাপলা, কদম, অপরাজিতা, কেয়া, কলাবতী, দোলনচাঁপা, পদ্ম, সোনাপাতি (চন্দ্রপ্রভা), কলমিলতা প্রভৃতি। বর্ষার মৌসুমি জনপ্রিয় কয়েকটি ফুলের পরিচিতি তুলে ধরা হলো–

শাপলা: শাপলা আমাদের জাতীয় ফুল। এ দেশের খালবিল, নদীনালা, পুকুর-ডোবায় এ ফুল পাওয়া যায়। বাংলাদেশ ছাড়া অন্য দেশেও শাপলার দেখা মেলে। জেলে, মাঝি, মুটে, কুলি থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরের লোকের হৃদয় হরণকারী এই ফুল।

শাপলা Nymphaeaceae পরিবারভুক্ত। এ ফুলের ৮টি গোত্র ও ৯০টি প্রজাতি রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শাপলার প্রজাতি হলো– সাদা বা লাল শাপলা, হলদে শাপলা, নীল শাপলা ও বড়ো শাপলা। সাদা শাপলা আমাদের জাতীয় ফুল। তাছাড়া শাপলা ফুল এবং পাতা সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর ফুলের নাম ঢ্যাপ। যার থেকে সুস্বাদু এবং ছোটো ছোটো গোলাকার মুড়ি তৈরি হয়ে থাকে। এই মুড়ি থেকে মোয়াও তৈরি হয়। গ্রামের ছেলেমেয়েরা ফুলের ডাঁটা ভেঙে সুন্দর সুন্দর গহনা বানিয়ে গলায় পড়ে থাকে। এছাড়া এই ফুল পুকুর-ডোবা, খাল-ঝিল-বিলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। খালবিলে অজস্র শাপলা ফুটে হাসতে থাকে। ছেলেমেয়েরা ডুবে ডুবে শাপলা-শালুক কুড়ায়, যেন ডুবসাঁতারে হার মানায় পানকৌড়িকেও। পাখি বা মানুষের ছড়ানো বীজ মাটি ফুঁড়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় বৃষ্টির নিমন্ত্রণে।

কদম: কদম বা কদম্ব ফুল। বর্ষাকালের অত্যন্ত আকর্ষণীয় এক ফুল। এই কদম ফুল Rubiaceae পরিবারভুক্ত। এর বৈজ্ঞানিক নাম Anthocephalus Indicus। কদম গাছ সাধারণত ৩০/৪০ ফুট লম্বা হয়। প্রস্থ উর্ধ্বে ৫ থেকে ৭ ফুট হয়। ফুল গোলাকৃতি লম্বা বৃন্তে দণ্ডায়মান। ফুলের রং হলুদ-সাদায় মেশানো। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসেই এই ফুল ফোটে। ঐতিহ্যবাহী এই ফুল এখনও গ্রামবাংলার আনাচেকানাচে, পথের পাশে, নদীর ধারে কিংবা কোনো কোনো উদ্যানে পাওয়া যায়। আমাদের ঐতিহ্যে ও সাহিত্যে কদম গাছ ও ফুল ২০০০ বছরের পুরোনো। এই ফুলের সৌন্দর্য আছে কিন্তু গন্ধ নেই। এর পাতা মাথাল তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। কদম ফুল ছেলেমেয়েদের খেলনার কাজে ব্যবহৃত হয়।

অপরাজিতা: বাংলায় অপরাজিতা, বৈজ্ঞানিক নাম Clitoria ternatea। অপরাজিতা ফুলগাছটি সুদৃশ্য লতানো শ্রেণির গাছ। বেড়ার ওপর বেয়ে ওঠার উপযোগী। এটির কয়েকটি জাত রয়েছে। একটির ফুলের রং ঘন নীল, একটির ফুল হালকা নীল, একটির ফুল সাদা এবং একটির ফুলে বিভিন্ন রঙের সমাহার দেখা যায়। অপরাজিতার বৃদ্ধি অপ্রতিরোধ্য। যে-কোনো গাছের পাশে এ গাছটি থাকুক না কেন এটির বৃদ্ধিতে তা কোনোভাবেই বাধা হয়ে উঠতে পারে না। অবলীলায় সে গাছ বেয়ে তার পাতা ও ফুল বিকশিত করে তোলে।

অপরাজিতা ফুল গাছটি লম্বায় ১৫ থেকে ২০ ফুট হয়ে থাকে। এ গাছের প্রতিটি পাতা পাঁচ থেকে সাতটি ডিম্বাকৃতির পত্রে বিভক্ত হয়ে থাকে। এটির পাতার রং হালকা সবুজ। দেখেই যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। বর্ষাকালে ফোটা ফুলের মধ্যে এ ফুলের শোভা ও সৌন্দর্য এক কথায় অনন্য। অপরাজিতা ফুলের কথা এলেই গাঢ় নীল রঙের চোখ জুড়ানো ফুলটির কথাই যেন চোখে ভেসে ওঠে।

কেয়া: আবহমানকাল ধরে বাংলার ঘরে ঘরে কেয়া ফুলের সুগন্ধের খ্যাতি ছড়িয়ে আছে। এই ফুল বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, মালয়েশিয়া, আফ্রিকার গ্রীষ্মমণ্ডল এবং অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায়। এর বৈজ্ঞানিক নাম Pandanus Odoratissimus, Pandanus। এর পাতা সরু লম্বা এবং কাঁটাযুক্ত। ফুলগুলো শ্বেতবর্ণ, ধানের ছড়ার মতো বিন্যস্ত এবং উগ্র সুবাসযুক্ত। এর বায়বীয় মূল কাণ্ড থেকে ঝুলে পড়ে বায়ু থেকে খাদ্য উপাদান নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। অনেক সময় ফুলগুলো পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে। এর ঘ্রাণে বিমুগ্ধ হয়ে সাপ ও বিষাক্ত কীটপতঙ্গ গাছে জড়িয়ে থাকে। সুন্দরকে তুলতে যেয়ে মৃত্যু নামক অসুন্দরের কোলে ঢলে পড়তে হয় অনেককেই। পারফিউম তৈরি করতে এর রস ব্যবহৃত হয়। গ্রাম্য মেয়েরা সৌন্দর্য চর্চায় এই ফুল অলংকার হিসেবে ব্যবহার করে।

কলাবতী: কলাবতী বর্ষার এক অনন্য ফুল। এর অন্য নাম সর্বজয়া। গ্রামবাংলার আনাচেকানাচে কিংবা শহরের বিলাসী বাগানে লাল-হলুদ এবং লাল ও হলুদ মেশানো কলাবতী ফুল পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ফুলগুলো Cannaceae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এর ৫৫টি প্রজাতি রয়েছে। এগুলো বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। এর গাছ দেখতে সরু, লম্বায় ৩ থেকে ৫ ফুট, পাতা দুই প্রান্তের দিকে চাপা, মাঝখানে প্রশস্ত। এগুলো একবীজপত্রী উদ্ভিদ। ৩টি বৃন্তযুক্ত এই ফুলে ৫টি পাপড়ি রয়েছে। ফুলের মাঝখানে দণ্ডায়মান বৃহৎ পুংকেশর। ফুলের আকৃতি গোড়ার দিকে সরু অগ্রভাগ ছড়ানো। বাংলাদেশ, ভারত ছাড়া আমেরিকা, ব্রাজিল ও আফ্রিকাতে এই ফুল পাওয়া যায়। সাধারণত স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় জন্মে। এর বৈজ্ঞানিক নাম Canna indica।

দোপাটি: বর্ষাকালের আরেক ফুলের নাম দোপাটি। এটি চমৎকার এক ফুল। যার ইংরেজি নাম Touch me not। বৈজ্ঞানিক নাম Impatiens balsamina। দোপাটি ফুলগুলো একক অথবা জোড়া হয়। গোলাপি, লাল, বেগুনি, লাইলাক, আকাশি, নীল, সাদা ছাড়াও আরও কয়েক রঙের ফুল হয়। দোপাটি ফুলের অনেকগুলো জাত রয়েছে। এই ফুলটি শুধু বর্ষা নয়, গ্রীষ্মকালেও ফোটে। আমাদের দেশে মে-জুন মাসে লাগালে বর্ষায় ফুল পাওয়া যায়। দোপাটি ফুলের গাছ টবেও লাগানো যায়। আর এ জন্য বামন জাতের দোপাটিগুলো বেশি ভালো। হাইব্রিড কিছু দোপাটি ইনডোর প্ল্যান্ট হিসেবে ঘরের ভেতরেও রাখা সম্ভব।

দোলনচাঁপা: দোলনচাঁপার ইংরেজি নাম Butterfly Ginger Lily, বৈজ্ঞানিক নাম Hedychium coronarium। এটিও সাদা রঙের ফুল। বড়ো বড়ো দুটি পাপড়ি। এ ফুল দেখতে ভারি মিষ্টি। পাপড়ি দুটো প্রজাপতির ডানার মতো দেখতে লাগে বলে এর ইংরেজি নাম বাটারফ্লাই লিলি। দোলনচাঁপার গাছ দেখতে হলুদ গাছের মতো। দোলনচাঁপা গাছ আসলে কন্দজ উদ্ভিদ। এ গাছ টবে লাগানোর জন্য উপযুক্ত। একটা টবে লাগালেই পুরো বাড়ি ঘ্রাণে ছেয়ে যাবে।

পদ্ম: পদ্ম ফুল পবিত্র সৌন্দর্যের প্রতীক। এটি কন্দ জাতীয় বহুবর্ষজীবী জলজ উদ্ভিদ। এ উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম Nelumbo nucifera, এটি Nymphaeaceae পরিবারের উদ্ভিদ। পদ্ম ফুলের বহু নাম রয়েছে যেমন– পদ্ম, কমল, শতদল, সহস্রদল, উৎপল, মৃণাল, পঙ্কজ, অম্বুজ, নীরজ, সরোজ, সরসিজ। সারা বছর পানি থাকে এমন জায়গায় পদ্ম ভালো জন্মে। তবে খালবিল, হাওর-বাঁওড় ইত্যাদিতে এ উদ্ভিদ জন্মে। এর বংশবিস্তার ঘটে কন্দের মাধ্যমে। পাতা পানির ওপরে ভাসলেও এর কন্দ পানির নীচে মাটিতে থাকে। পানির উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে গাছ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাতা বেশ বড়ো, পুরু, গোলাকার ও রং সবুজ। পাতার বোঁটা বেশ লম্বা, ভেতর অংশ অনেকটাই ফাঁপা। ফুলের ডাঁটার ভেতর অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য ছিদ্র থাকে। ফুল আকারে বড়ো এবং অসংখ্য নরম কোমল পাপড়ির সমন্বয়ে সৃষ্টি পদ্ম ফুলের। ফুল ঊর্ধ্বমুখী, মাঝে পরাগ অবস্থিত। ফুটন্ত তাজা ফুলে মিষ্টি সুগন্ধ থাকে। ফুল ফোটে রাত্রিবেলা এবং সকাল থেকে রৌদ্রের প্রখরতা বৃদ্ধির পূর্ব পর্যন্ত প্রস্ফুটিত থাকে। রৌদ্রের প্রখরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফুল সংকুচিত হয়ে যায় ও পরবর্তী সময়ে প্রস্ফুটিত হয়। ফুটন্ত ফুল এভাবে অনেক দিন ধরে সৌন্দর্য বিলিয়ে যায়। ফুলের রং লাল, গোলাপি, সাদা ও সুগন্ধিযুক্ত। তিন ধরনের পদ্ম ফুল রয়েছে, যেমন: শ্বেতপদ্ম, লালপদ্ম, নীলপদ্ম।

সোনাপাতি/ চন্দ্রপ্রভা/ হৈমন্তী/ গৌরিচৌরি: সোনাপাতি অসম্ভব সুন্দর ফুল। অনেকটা অলকানন্দার মতো দেখতে হলুদ। সাধারণত গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হেমন্তে ফুল ফুটলেও সারা বছরই কমবেশি এর প্রস্ফুটন দেখা যায়। চন্দ্রপ্রভা, হৈমন্তী ও গৌরিচৌরি নামেও একে ডাকে। এর বৈজ্ঞানিক নাম Tecoma gaudichaudi এবং এটি Bignoniaceae পরিবারের উদ্ভিদ। Yellow bells, Yellow trumpet নামেও এর পরিচিতি রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভারজিন আইল্যান্ডের অফিসিয়াল ফ্লাওয়ার হিসেবে এর ব্যবহার আছে। এটি একটি চিরসবুজ উদ্ভিদ, যা ৪ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। এ গাছের পাতার কিনারা খাঁজকাটা এবং পাতা যৌগিক। পাতা একসঙ্গে দুই থেকে তিনটি হয়ে থাকে। ডালের গিটে থোকায় থোকায় ফুল ফোটে। এর বীজ ছোটো আকৃতির হয়ে থাকে। বীজ ও কলমে চারা হয়। যখন ফুল ফোটে হলুদ ফুল আর সবুজ পাতার রঙে এক অপার্থিব ভালো লাগায় মন ভরে ওঠে।

কলমিলতা ফুল: কলমিলতা ফুল গ্রামগঞ্জে খুবই জনপ্রিয় এবং সুপরিচিত একটি ফুল। আবার কোনো কোনো অঞ্চলে এই ফুল মাইক ফুল নামে পরিচিত। গাছগুলো দেখতে অনেকটা লতার মতো। আর ফুলগুলো একেবারেই মাইকের মতো। কলমিলতার বৈজ্ঞানিক নাম– Ipomoea aquatica। ভোর থেকেই এই ফুলগুলো ফুটতে শুরু করে আর তা ধরে রাখে দুপুর পর্যন্ত এরপর ফুলগুলো আস্তে আস্তে গাছ থেকে ঝরে পড়ে। এই ফুলগুলোর ঘ্রাণ খুবই হালকা কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর।

উল্লিখিত ফুল ছাড়াও বর্ষাকালে ঘাস ফুল, পানা ফুল, কচু ফুল, ঝিঙে ফুল, কুমড়া ফুল, হেলেঞ্চা ফুল, কেশরদাম, পানিমরিচ, পাতা শেওলা, কাঁচকলা, পাট ফুল, বনতুলসী, নলখাগড়া, ফণীমনসা, উলটকম্বল, কেওড়া, গোলপাতা, শিয়ালকাঁটা, কেন্দার, কামিনী, রঙ্গন, অলকানন্দ, বকুল এবং নানা রঙের অর্কিড ফোটে। বর্ষা ঋতু যেন আমাদের কাছে ফুলের জননী হয়ে ধরা দেয়।

আবহমানকাল ধরেই আমাদের প্রকৃতিকে বর্ষার ফুল স্বতন্ত্র সৌন্দর্য বিলিয়ে দিয়ে আসছে অসীম উদারতায়। বর্ষা ও তার ফুল যেন বাংলার প্রকৃতির এক আত্মা হয়ে আসে; বৃষ্টিস্নাত বর্ষার ফুলের উজ্জ্বল উপস্থিতি মানুষের মনে রং লাগিয়ে আসছে। বর্ষা নামলেই হাত চলে যায় প্রিয়ার খোঁপায় আর চোখ চলে যায় জানালার ফাঁক গলিয়ে। তাই তো কবি কণ্ঠে উচ্চারিত হয় অনন্য কবিতার পঙ্‌ক্তিমালা–

আঁধারে ডুবিছে সবি/ কেবল হৃদয়ে হৃদি অনুভবি।

শামস্ নূর: প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক

নিবন্ধ

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে হাইড্রোগ্রাফির ভূমিকা

সুস্মিতা চৌধুরী

‘Hydrography Underpinning the Digital Twin to the Ocean’ –প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২১শে জুন বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস পালিত হয়েছে। হাইড্রোগ্রাফি বিষয়ে জনসচেতনতা এবং সাগর-মহাসাগরের বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যভাণ্ডার বৃদ্ধিতে হাইড্রোগ্রাফির ভূমিকা তুলে ধরার লক্ষ্যে দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়।

হাইড্রোগ্রাফি হচ্ছে– সমুদ্র, নদী, হ্রদ, উপকূল ইত্যাদি এলাকার পানির গভীরতাসহ অন্যান্য ভৌত উপাদান পরিমাপের বিজ্ঞান, আর এ বিষয়ে পারদর্শীগণকে হাইড্রোগ্রাফার বলা হয়ে থাকে। ১৯২১ সালের ২১শে জুন আন্তর্জাতিক হাইড্রোগ্রাফি সংস্থা (IHO) প্রতিষ্ঠার দিনকে বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়।

হাইড্রোগ্রাফির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সমুদ্রগামী জাহাজের নিরাপদ চলাচল, পরিবেশ রক্ষা, সুনীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে সমুদ্রকে রক্ষা করার জন্য। এছাড়া আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সমুদ্রের তথ্য-উপাত্ত ভার্চুয়াল পরিবেশে দৃশ্যায়িত করে সমুদ্রের পরিবেশ ও ইকোসিস্টেম আরও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিশ্বজুড়ে হাইড্রোগ্রাফার কমিউনিটি সামুদ্রিক তথ্য সংগ্রহ ও আদান-প্রদান করে সমুদ্রের নিরাপদ ব্যবহার তথা সমুদ্র রক্ষায় ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

উনিশ শতকের শেষের দিকে বিশ্বব্যাপী হাইড্রোগ্রাফির কার্যক্রম তদারকি ও নটিক্যালচার্টিং সার্ভিসের জন্য সার্বজনীন পদ্ধতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে হাইড্রোগ্রাফার কমিউনিটি ও সমুদ্রবিজ্ঞানীরা একটি স্থায়ী কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৮৮৯, ১৯০৮ এবং ১৯১২ সালে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯১৯ সালে যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্সের হাইড্রোগ্রাফারদের সহযোগিতায় লন্ডনে একটি আন্তর্জাতিক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সেখানে ২৪টি দেশের হাইড্রোগ্রাফাররা অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে, আন্তর্জাতিক হাইড্রোগ্রাফিক ব্যুরো (আইএইচবি) নামে একটি স্থায়ী সংগঠন প্রতিষ্ঠা এবং এটি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৮টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে ১৯২১ সালের ২১শে জুন আনুষ্ঠানিকভাবে আইএইচবি-এর কার্যক্রম শুরু হয়। বিশিষ্ট সমুদ্রবিজ্ঞানী ১ম প্রিন্স অ্যালবার্টের প্রস্তাব অনুযায়ী সংস্থাটির প্রধান কার্যালয় মোনাকোতে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭০ সালে সকল সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে সংস্থাটি আইএইচবি নামটি পরিবর্তন করে ইন্টারন্যাশনাল হাইড্রোগ্রাফিক অর্গানাইজেশন (আইএইচও) নামে পরিচিতি লাভ করে। হাইড্রোগ্রাফি ও নটিক্যালচার্টিং-এর বিষয়ে জাতিসংঘ আইএইচওকে একমাত্র যোগ্য ও স্বীকৃত সংস্থা হিসেবে গণ্য করে এবং এ সংস্থাকে ২০০২ সালে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকের মর্যাদা প্রদান করে। এখন পর্যন্ত ৯৮টি দেশ আইএইচও সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ ২০০১ সালের ২রা জুলাই ৭০তম দেশ হিসেবে সংস্থাটির সদস্যপদ লাভ করে।

হাইড্রোগ্রাফিক বিষয়ে দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ১৯৮৩ সালে হাইড্রোগ্রাফিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করে, যা এ বিষয়ে দেশের মধ্যে একমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। গর্বের ও আনন্দের বিষয়, ২০০৫ সালে নৌবাহিনীর হাইড্রোগ্রাফিক স্কুলটি ইন্টারন্যাশনাল বোর্ড অব স্ট্যান্ডার্ডস অব কম্পিটেন্স (আইবিএমসি) থেকে ক্যাটাগরি ‘বি’ হাইড্রোগ্রাফিক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করার স্বীকৃতি অর্জন করে। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর হাইড্রোগ্রাফিক স্কুলের খ্যাতি আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। স্কুলটি শুধুমাত্র বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ও অন্যান্য সরকারি সংস্থার হাইড্রোগ্রাফারদেরই নয়, বন্ধুপ্রতীম দেশের নির্বাচিত শিক্ষার্থীদেরও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এখন পর্যন্ত ৯৫ জন অংশগ্রহণকারী এই মর্যাদাশীল প্রতিষ্ঠান থেকে এফআইজি/আইএইচও/আইসিএ স্বীকৃত ক্যাটাগরি ‘বি’ হাইড্রোগ্রাফি কোর্স সম্পন্ন করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে আইএইচও সদস্য রাষ্ট্রের ২৪ জন বিদেশি শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন সরকারি মেরিটাইম প্রতিষ্ঠানের ১৯ জন হাইড্রোগ্রাফার।

বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস ২০২৩ উপলক্ষে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় ২১শে জুন ২০২৩ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর মাল্টিপারপাস হলে আয়োজিত সেমিনারে নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এবং নৌবাহিনীপ্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল এক ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করেন– আইএসপিআর

সমুদ্র জরিপ একটি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কর্মকাণ্ড, যা প্রতিনিয়ত ব্যাপক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। বাংলাদেশের জন্য জরিপ কার্যে আধুনিক প্রযুক্তি সংগ্রহ ও এর যথাযথ ব্যবহারের জন্য আন্তর্জাতিক সাহায্য, সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের কোনো বিকল্প নেই। এ বাস্তবতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী আন্তর্জাতিক হাইড্রোগ্রাফিক সংস্থাসমূহের সাথে ঘনিষ্ঠ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর হাইড্রোগ্রাফি সার্ভিসের আধুনিকায়নের যাত্রা সূচনা হয়েছিল ১৯৯৬ সালে ফরাসি

সরকারের সহযোগিতায়। উক্ত সহযোগিতায় হাইড্রোবাংলা প্রজেক্ট-১ ও ২-এর মাধ্যমে ডিজিটাল হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে যুগে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পদার্পণ ঘটে। এ সকল কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বয় করার জন্য ২০০১ সালে বাংলাদেশ নেভি হাইড্রোগ্রাফিক অ্যান্ড ওশানোগ্রাফিক সেন্টার (বিএনএইচওসি) চট্টগ্রামে বানৌজা ঈসা খান ঘাঁটিতে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই বর্তমানে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভিসের মাঠ পর্যায়ের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।

১৯৮৪ সালে বানৌজা দর্শক ও বানৌজা তল্লাশি নামে দুটি জরিপ জাহাজ নিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভেস্কোয়াড্রনের যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে ৫টি জরিপ জাহাজের সমন্বয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর হাইড্রোগ্রাফিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। বিগত বছরে আরও দুটি জরিপ বোট সংযোজন করা হয়েছে। এ জাহাজ ও বোটগুলোর সমন্বয়ে বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকায় ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকায় আইএইচও-এর মানদণ্ড অনুসরণ করে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ পরিচালনা করা হচ্ছে। মেরিটাইম শিপিং ও নেভিগেশনের নিরাপত্তার জন্য এ দেশের সমুদ্র এলাকায় শতভাগ পেপার চার্টসহ ইলেকট্রনিক নেভিগেশনাল চার্ট (ইএনসি) কাভারেজ ইতোমধ্যে নিশ্চিত করা হয়েছে। এ দেশের উপকূলের পরিবর্তনশীল অবস্থা বিবেচনায় পরিকল্পিত সূচি মোতাবেক নিয়মিতভাবে সকল নেভিগেশন চ্যানেল ও বাণিজ্যিক রুটের জরিপ করা হচ্ছে। এছাড়াও, উপকূলবর্তী অফশোর রিগ স্থাপন, পরিচালনা ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য জরিপ ডাটা ও ওশানোগ্রাফিক তথ্য-উপাত্ত প্রদানের মাধ্যমে কোস্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও কোস্টাল জোন ব্যবস্থাপনায় নৌবাহিনীর জরিপ জাহাজ ও বোটসমূহ প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখে চলেছে। এছাড়াও সমুদ্রসীমা নির্ধারণের জন্য হাইড্রোগ্রাফিক ডাটা অত্যন্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর হাইড্রোগ্রাফিক তথ্য-উপাত্তের উপর ভিত্তি করেই আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাথে বিদেশি দেশসমূহের সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি হয়েছে।

বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস ২০২৩ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী পৃথক বাণী দিয়েছেন। বাণীতে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত এবং স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমুদ্র এলাকায় সার্বভৌমত্ব অর্জনের জন্য 'টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট ১৯৭৪' প্রণয়ন করেন। বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সরকার সমুদ্র এবং সমুদ্রভিত্তিক অর্থনীতির ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে আইনগতভাবে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে বিশাল সমুদ্র এলাকার ওপর আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। আয়তনে প্রায় দেশের মূল ভূখণ্ডের সমান এই বিশাল সমুদ্র এলাকা প্রাকৃতিক সম্পদের এক অপার সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বাণীতে বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে দেশের সমুদ্র এলাকা ও সমুদ্রসম্পদের ওপর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তিনি 'টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট ১৯৭৪' প্রণয়ন করেন, যা ছিল আমাদের সমুদ্র এলাকার ওপর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এরই ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগ সরকার ২০১২ সালে মিয়ানমারের সাথে এবং ২০১৪ সালে ভারতের সাথে সামুদ্রিক বিরোধ মিটিয়ে বঙ্গোপসাগরে ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র এলাকার ওপর বাংলাদেশের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। ২০২১ সালে আমরা 'টেরিটোরিয়াল ওয়াটার অ্যান্ড টেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট ১৯৭৪'-কে সংশোধন ও হালনাগাদ করি। বঙ্গোপসাগরের সুবিশাল নতুন এই সমুদ্র এলাকা এবং এর অযুত সম্পদ আমাদের জন্য উন্মুক্ত করেছে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি গড়ে তোলার প্রয়াসে বর্তমান সরকার সুনীল অর্থনীতিকে প্রাধান্য দিয়েছে। সর্বোপরি, সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জলসীমা নিরাপদ রাখার জন্য এ দেশের হাইড্রোগ্রাফি সংস্থাসমূহ নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের পর সমুদ্র সম্পদের অনুসন্ধান ও ব্যবহার সম্পর্কিত কার্যক্রম জোরদার হচ্ছে, যা আমাদের সমুদ্রসীমা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সুস্মিতা চৌধুরী: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

জাতিসংঘের FAO কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত বাংলাদেশ

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) কাউন্সিলের এশিয়া অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে সদস্য নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ। ৬ই জুলাই চলমান ৪৩তম FAO কনফারেন্সে ১৯৪টি সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধির অংশগ্রহণে সংস্থাটির কাউন্সিলের সদস্য পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে বাংলাদেশ ২০২৪ সালের ১লা জুলাই থেকে ২০২৭ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত মেয়াদে সর্বসম্মতিক্রমে সদস্য নির্বাচিত হয়। বাংলাদেশ কাউন্সিলের নীতি ও নির্বাহী পর্যায়ে FAO-এর কার্যক্রম, বাজেট বাস্তবায়ন, ফলাফলভিত্তিক কাঠামোর আওতায় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণসহ এর প্রশাসনিক দিকগুলো তদারকিতে অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের সাথে নেতৃত্ব দেবে।

FAO কাউন্সিলের সদস্য পদে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে রোমস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। ইতালির রোমে অবস্থিত জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সদর দপ্তরে চলমান ৪৩তম কনফারেন্স হাইব্রিড মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক ৮ (আট) সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। উক্ত প্রতিনিধিদলে অন্যান্যদের মধ্যে আরও রয়েছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মিজ ওয়াহিদা আক্তার, ইতালিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও FAO-তে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি জনাব মো. শামীম আহসান। উল্লেখ্য, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা যা ক্ষুধা দূরীকরণে আন্তর্জাতিক উদ্যোগে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। বাংলাদেশ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) ৪২তম কনফারেন্সে এশিয়া অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে ১লা জুলাই ২০২২ থেকে ৩০শে জুন ২০২৪ মেয়াদে কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল।

প্রতিবেদন: সৌভিক সেন

সুন্দরবন রক্ষায় করণীয়

ফারিহা হোসেন

পৃথিবীর অন্যতম ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন এবং দেশের অন্যতম আকর্ষণ পার্বত্য অঞ্চলের বনভূমির আয়তন ও পরিমাণ কমছে। আয়তন কমে আসায় সুন্দরবনের প্রতিবেশ ব্যবস্থা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পাশাপাশি কমে আসছে গাছ, লতাগুল্ম, মাছসহ নানা প্রজাতির প্রাণী। স্বাদু ও লোনাপানি মিলিত হয় এমন ভূমিতে সুন্দরবনের মতো বন গড়ে উঠেছে। বনবিজ্ঞানীরা এ ধরনের বনের নাম দিয়েছেন ম্যানগ্রোভ। বিশ্বের আরও বেশকিছু সমুদ্র উপকূলে ম্যানগ্রোভ আছে। কিন্তু সুন্দরবনের মতো এত বড়ো ম্যানগ্রোভ বন বিশ্বের আর কোথাও নেই।

তথ্য অনুযায়ী, বৃহত্তর খুলনা জেলার গেজেটিয়ার লেখার কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৭০ সালে। ১৯৭৮ সালে ছাপা ওই গেজেটিয়ারে বলা হয়েছিল, নির্বিচারে বনসম্পদ লুট ও প্রাণী হত্যা বন্ধ না হলে সুন্দরবন বিবর্ণ, বৃক্ষলতাহীন, প্রাণহীন হয়ে পড়বে। গবেষকরা বলছেন, সুন্দরবনের কিছু গাছ, প্রাণী ও পাখি বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বঙ্গোপসাগর উপকূলের বড়ো অংশজুড়ে সুন্দরবন। সরকারি দলিল অনুযায়ী, সুন্দরবনের ৬০ শতাংশ বাংলাদেশে, বাকি ৪০ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে। বাংলাদেশ অংশের সুন্দরবনে গাছ, লতাগুল্ম, পাখি, প্রাণী, মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণীর প্রজাতির সংখ্যা বেশি।

২০২০ সালে বিশ্বব্যাংক তাদের এক প্রতিবেদনে সুন্দরবনের আয়তন কমে আসার তথ্য প্রকাশ করে। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সুন্দরবন ও বনসংলগ্ন এলাকার মানুষের টিকে থাকার বিষয়ে প্রতিবেদন করা হয়েছিল। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৯০৪-১৯২৪ সালে দুই দেশের সুন্দরবনের আয়তন ছিল ১১ হাজার ৯০৪ বর্গকিলোমিটার। ১৯৬৭ সালে তা কমে হয় ১১ হাজার ৬৬৩ বর্গকিলোমিটার। ২০০১ সালে আয়তন কমে দাঁড়ায় ১১ হাজার ৫০৬ বর্গকিলোমিটারে। ২০১৫-২০১৬ সালে আয়তন ছিল ১১ হাজার ৪৫৩ বর্গকিলোমিটার। অর্থাৎ গত ১০০ বছরে সুন্দরবনের আয়তন ৪৫১ বর্গকিলোমিটার কমে গেছে। প্রতিবেদনে বাংলাদেশের সুন্দরবনের আয়তন কমে যাওয়ার পৃথক কোনো পরিসংখ্যান দেওয়া হয়নি। তবে ওই পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৯০৪-১৯২৪ সালে বাংলাদেশ অংশের সুন্দরবনের আয়তন ছিল ৭ হাজার ১৪২ বর্গকিলোমিটার। ২০১৫-২০১৬ সালে আয়তন কমে ৬ হাজার ৮৭১ বর্গকিলোমিটারে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ১০০ বছরে সুন্দরবনের ২৫২ বর্গকিলোমিটার হারিয়ে গেছে। এ হিসাবে প্রতিবছর আড়াই বর্গকিলোমিটারের মতো বন হারিয়ে যাচ্ছে।

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের গবেষণা সংস্থা সিজিআইএসের গবেষণায় দেখা গেছে, সুন্দরবনের আয়তন কমছে, জলাভূমি বাড়ছে। বনাঞ্চলে ঘুরে এবং উপগ্রহের তথ্য বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন, ২৭ বছরে ৭৬ বর্গকিলোমিটার জমি কমেছে সুন্দরবনের। বনের আয়তন কমছে কি না, সে বিষয়ে সহমত বা দ্বিমত পোষণ করা যায় না। ভূতত্ত্ববিদরা বলছেন, দেশের কিছু এলাকাসহ সুন্দরবন হচ্ছে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার 'অ্যাকটিভ ডেলটা' অঞ্চলে। অর্থাৎ এই বদ্বীপ এলাকায় ভূগঠন প্রক্রিয়া শেষ হয়নি। এই অঞ্চলের ভূমি এখনো ভাঙাগড়ার মধ্যে আছে। সুন্দরবনের মধ্যে ছোটো-বড়ো অসংখ্য নদী ও খাল রয়েছে। জালের মতো বিছানো এসব খাল-নদীর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার। এসব নদী-খালে দিনে দুবার জোয়ারের পানিতে ভরে ওঠে, দুবার ভাটায় পানি নেমে যায়। জোয়ার-ভাটার কারণে নদীর পাড় ভাঙে-গড়ে। তবে বিগত ১০০ বছরে ভাঙনই বেশি লক্ষ করা গেছে। নদী ভাঙনের কারণে বনের জমি কমছে এমন তথ্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার।

শুধু আয়তনের কারণে নয়, জীববৈচিত্র্যের জন্যও সুন্দরবন অনন্য। বিশ্বব্যাংকের ২০২০ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বনে ৫২৮ প্রজাতির বৃক্ষ ও লতাগুল্ম আছে, আছে ৩০০ প্রজাতির পাখি। ৫৮ প্রজাতির সরীসৃপ, ৪২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী এবং ৯ প্রজাতির উভচর প্রাণী সুন্দরবনে চরে বেড়ায়। সুন্দরবনের নদী-খালে ২৫০ প্রজাতির মাছ আছে। আছে বহু প্রজাতির কীটপতঙ্গ, কাঁকড়া, শামুক-ঝিনুক।

আছে নানা ধরনের ছত্রাক, শেওলা। কিন্তু চার দশক ধরে সুন্দরবনে উত্তর থেকে আসা স্বাদুপানির পরিমাণ কমেছে, লোনাপানির প্রবাহ বেড়েছে। এর ফলে লোনাপানি সহিষ্ণু গাছ ও লতাগুল্মের প্রজাতি টিকে থাকার সম্ভাবনা বেড়েছে। কমেছে বা ঝুঁকিতে পড়েছে স্বাদুপানি বা ব্রাকিস সহিষ্ণু প্রজাতিগুলো। মোংলা সমুদ্রবন্দরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে প্রায় ১০০ শিল্পকারখানা। এসব কারখানার বর্জ্য পশুর নদ হয়ে সুন্দরবনে পৌঁছায়। বড়ো বড়ো জাহাজ ছাড়াও অসংখ্য নৌযান নিয়মিত যাতায়াত করে পশুর নদ দিয়ে। সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে জাহাজসহ সব নৌযান চলাচল করায় উচ্চ শব্দ বনের নিস্তব্ধতা ভাঙে। তদুপরি সুন্দরবনে আছে শিকারির উৎপাত। মাছ ধরার নামে জলজ প্রাণী নিধনও চলছে। জেলেরা ছোটো ছোটো খালে বিষ ঢেলে মাছ ধরে। এতে মাছের সঙ্গে অন্যান্য জলজ প্রাণীও মরছে। মানুষের এসব কর্মকাণ্ড ছাড়াও সুন্দরবনে আঘাত হানে ঝড়-জলোচ্ছ্বাস। ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে শুধু যে গাছের ক্ষতি হয় তা নয়, পশুপাখিরও প্রাণহানি ঘটে। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলছেন, বছর বছর ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের সংখ্যা বাড়ছে। প্রকৃতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা আইইউসিএনের তথ্য উদ্ধৃত করে বিশ্বব্যাংক বলছে, সুন্দরবন থেকে ১৯ প্রজাতির পাখি, ১১ ধরনের স্তন্যপায়ী ও এক প্রজাতির সরীসৃপ আঞ্চলিকভাবে বিলুপ্ত হয়েছে। বিলুপ্তির ঝুঁকিতে থাকা মাছ ও গাছের প্রজাতির বর্ণনাও তাতে আছে। সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বন ও পরিবেশ বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের গবেষণায় দেখা গেছে, ১৯৮৯ সালে সুন্দরবনে ঘন বন ছিল ৬৩ শতাংশ। ২০১৪ সালে তা কমে হয় ৩৮ শতাংশ। বিশ্বব্যাংকের গবেষণায় যুক্ত পরিবেশ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আইনুন নিশাত বলেন, শত শত বছর ধরে সুন্দরবন ঝড়ঝঞ্ঝা থেকে মানুষকে রক্ষা করে চলেছে। বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে ও অর্থনীতিতে এর অবদান অপরিসীম। দেশে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট দেশের বাস্তুতন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং এর একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। দেশের ম্যানগ্রোভ বনগুলো অসংখ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল, বিশেষ করে মানুষের কার্যকলাপ এবং প্রাকৃতিক কিছু কারণে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছিল। এর মধ্যে বন উজাড় করার কারণে ম্যানগ্রোভ বন হুমকির মধ্যে পড়েছে। কাঠ, জ্বালানি কাঠ এবং কৃষিজমির চাহিদা ব্যাপকভাবে ম্যানগ্রোভ গাছ কাটার দিকে মানুষকে পরিচালিত করে। এ কারণে অসংখ্য প্রজাতি তাদের আবাসস্থল হারিয়েছে এবং পরিবেশগত ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়েছে। ম্যানগ্রোভ বনকে চিংড়ির খামারে রূপান্তরিত করার ফলে বাস্তুতন্ত্রের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। চিংড়ি চাষের জন্য বাঁধ ও খাল নির্মাণ প্রাকৃতিক জলপ্রবাহের ধরনকেও ব্যাহত করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ ঘূর্ণিঝড় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ একটি দেশ। ২০০৭ সালে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় সিডর এবং ২০০৯ সালে ঘূর্ণিঝড় আইলায় গাছ উপড়ে এবং লোনা জলের অনুপ্রবেশসহ ম্যানগ্রোভ বনের ব্যাপক ক্ষতি করে। ২০১৪ সালে তেলবাহী ট্যাংকার সুন্দরবনের শ্যালা নদীতে ডুবে গেলে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি তেল শ্যালা নদী দিয়ে সমগ্র সুন্দরবনে ছড়িয়ে পড়ে। এতে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যের ওপর নেমে আসে অন্ধকার।

স্থানীয় সম্প্রদায়গুলো ম্যানগ্রোভ বন সংরক্ষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বনের ওপর নির্ভরতা কমাতে এবং তাদের টেকসই ব্যবহারকে উন্নীত করতে সম্প্রদায়ভিত্তিক উদ্যোগ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা অনুশীলন বিশেষ করে সহ-ব্যবস্থাপনা এবং জীবিকার বিকল্প প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সরকার ম্যানগ্রোভ বন সংরক্ষণকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। বন উজাড়, অবৈধ গাছ কাটা এবং চোরাচালান নিয়ন্ত্রণের বিধান বাস্তবায়ন জরুরি। ম্যানগ্রোভ সম্পদের টেকসই ব্যবহার সংরক্ষণ এবং জীবিকার চাহিদার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রচারণা করা হচ্ছে। ইকো ট্যুরিজম, মৌমাছি পালন, কাঁকড়া চাষ এবং মধু উৎপাদনের মতো পরিবেশবান্ধব কাজে জড়িত থাকা সম্প্রদায়গুলোকে উৎসাহিত করা দরকার।

বাংলাদেশের ম্যানগ্রোভ বন জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে, এর মাধ্যমে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং ঘূর্ণিঝড়ের ঘনত্ব ও তীব্রতা হ্রাস করে। এছাড়াও কাঠ, জ্বালানি ও মণ্ডের মতো প্রথাগত বনজ সম্পদের পাশাপাশি এখান থেকে নিয়মিত আহরণ করা হয় বিপুল পরিমাণ গোলপাতা, মধু, মৌচাকের মোম, মাছ, কাঁকড়া এবং শামুক-ঝিনুক। বৃক্ষরাজি পূর্ণ সুন্দরবনের ভূমি একইসঙ্গে প্রয়োজনীয় আবাসস্থল, পুষ্টি উৎপাদক, পানি বিশুদ্ধকারক, পলি সঞ্চয়কারী, ঝড়-তুফান প্রতিরোধক, উপকূল স্থিতিকারী শক্তিসম্পদের বিপুল আধার এবং দারুণ সম্ভাবনাময় পর্যটন কেন্দ্র। সমুদ্র, নদীমেখলা প্রকৃতি আর শ্যামল-সবুজ পরিবেশের সংমিশ্রণে উপকূল অঞ্চল গোটা দেশের, সমাজের, অর্থনীতির জন্য অনিবার্য অবকাঠামো শুধু নয়, উন্নয়ন প্রচেষ্টায় ভারসাম্য রক্ষার জন্যও অপরিহার্য।

মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বিভিন্ন জীবজন্তুর পদচারণায় সমৃদ্ধ সুন্দরবন পর্যটকদের জন্য আজও আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে বিবেচিত। সুন্দরবনকে ঘিরে পরিবেশবান্ধব ইকো ট্যুরিজম গড়ে তোলা, আশপাশের জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প জীবিকার উদ্যোগ নেওয়া, পর্যটনভিত্তিক গ্রাম গড়ে তোলা, বনের আকার বাড়ানো এবং বনাঞ্চল রক্ষায় বিদ্যমান আইনের কঠোর প্রয়োগ এবং এ সংক্রান্ত পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া অত্যাবশ্যক।

ফারিহা হোসেন: ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক ও কলাম লেখক

ই-পাসপোর্ট চালু হলো অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনে

অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরায় বাংলাদেশ হাইকমিশনে ৩রা জুন থেকে চালু হলো ই-পাসপোর্ট। অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম আল্লামা সিদ্দিকী ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. নূরুল আনোয়ার।

অনুষ্ঠানে হাইকমিশনার বলেন, ই-পাসপোর্টে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হওয়ায় এর বিশ্বাস ও গ্রহণযোগ্যতার পাশাপাশি বহির্বিশ্বে বাংলাদেশি পাসপোর্টের মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশের পাসপোর্টকে পৃথিবীর প্রথম সারির পাসপোর্টের মানে উন্নীত করায় তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ই-পাসপোর্ট আবেদন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য শীঘ্রই বাংলাদেশ হাইকমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। ইতঃপূর্বে আরও ২৩টি মিশনে ই-পাসপোর্ট চালু হয়েছে এবং ২৩টি মিশনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

প্রতিবেদন: আহনাফ হোসেন

হেপাটাইটিস: সচেতনতায় বাঁচবে প্রাণ

ফাতেমা আক্তার

হেপাটাইটিস একটি নীরব ঘাতক। এটা নীরবে একজন থেকে আরেকজনের দেহে ছড়ায়। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তাদের জীবদ্দশার কোনো এক সময় এ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, যাদের মধ্যে ২৪ থেকে ৩৫ কোটি মানুষ দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণে আক্রান্ত। ২৮শে জুলাই বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস। প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী দিবসটি পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সারা বিশ্বে হেপাটাইটিস এ, বি, সি, ডি ও ই সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করা; রোগনির্ণয়, প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা। ২০০৮ সালের ২৮শে জুলাই বিশ্ববাসীকে সচেতন করতে হেপাটাইটিস দিবস পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করে 'বিশ্ব হেপাটাইটিস অ্যালায়েন্স'। ২০১১ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবসটিকে স্বীকৃতি দেয়। নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী বারুচ স্যামুয়েল ব্লুমবার্গ হেপাটাইটিস বি ভাইরাস আবিষ্কার করেন। তিনি এই রোগ নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষাব্যবস্থা উন্নত করেন ও টিকা দেওয়া শুরু করেন। চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁর এই অবদানকে স্বীকৃতি জানাতে তাঁর জন্মদিনে (২৮শে জুলাই) বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস পালিত হয়। প্রতিবছর গোটা বিশ্বে হেপাটাইটিসে আক্রান্ত হয়ে প্রায় ১.৪ মিলিয়ন লোক মারা যায়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে ৫ ধরনের হেপাটাইটিস রয়েছে। হেপাটাইটিস এ এবং ই স্বল্পমেয়াদি লিভার রোগ। এটি বিশ্রাম নিলে এক পর্যায়ে সেরে ওঠে। তবে প্রাণঘাতী হচ্ছে হেপাটাইটিস বি এবং সি ভাইরাসের সংক্রমণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে, বাংলাদেশে হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি' ভাইরাসে প্রায় ১ কোটি মানুষ আক্রান্ত। বেসরকারি হিসাবে হেপাটাইটিসে দেশে প্রতিবছর ২০ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। সারা বিশ্বে হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি' ভাইরাসে সংক্রমিত ১০ জনের মধ্যে ৯ জনই জানেন না যে তার শরীরে এই ভাইরাস আছে। আমাদের দেশে যদি কোনো প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় সেটা মূলত ই ভাইরাসের আউট ব্রেক। কারণ এটা ছড়ায় বেশি। ই ভাইরাস মূলত পানির মাধ্যমে ছড়ায়। লিভার ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ হেপাটোলজি সোসাইটির এক গবেষণায় বলা হয়েছে, জন্ডিস নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের শতকরা ৭৬ ভাগ হেপাটাইটিস ভাইরাসে আক্রান্ত। হেপাটাইটিস বি একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ যা যকৃত বা লিভারকে আক্রমণ করে। হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব বাংলাদেশে বেশ লক্ষণীয়। বিভিন্ন কারণে শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে গিয়ে অথবা কাউকে রক্ত দিতে গিয়ে সাধারণত কারও কারও শরীরে ভাইরাসটি ধরা পড়ে। কারণ, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটি রক্তে সুপ্ত অবস্থায় দীর্ঘকাল রয়ে যায়। সংক্রমণের প্রথম দিকে কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না। তবে অনেক ক্ষেত্রে বমি বমি ভাব, চামড়া হলুদ হওয়া, ক্লান্তি, পেট ব্যথা, প্রস্রাব হলুদ হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। সাধারণত এই লক্ষণগুলো কয়েক সপ্তাহ স্থায়ী হয় এবং কদাচিৎ লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর পরিশেষে মৃত্যু হয়। সংক্রমণের পর রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে প্রায় ৩০ থেকে ১৮০ দিন সময় লাগতে পারে। বাংলাদেশে হেপাটাইটিসে আক্রান্তদের একটা বড়ো অংশ ঝাড়ফুঁক, পানি পড়া, ডাব পড়া নেওয়ার মতো কবিরাজি চিকিৎসার দ্বারস্থ হন। হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের কোনো চিকিৎসা নেই– অনেকের মধ্যে এমন ভুল ধারণা রয়েছে। আবার অনেকে মনে করেন,

কোনো সমস্যা যেহেতু হচ্ছে না, তাহলে চিকিৎসার কী দরকার। বর্তমানে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস নির্মূলে খুবই কার্যকরী কিছু ওষুধ রয়েছে। রোগের প্রাথমিক অবস্থায় সঠিক চিকিৎসা করলে অনেক ক্ষেত্রে এটি নিরাময় সম্ভব। তাছাড়া চিকিৎসা নিলে এই ভাইরাসজনিত জটিলতা যেমন লিভার সিরোসিস ও লিভার ক্যান্সার থেকে বেশির ভাগ রোগীকে বাঁচানো সম্ভব।

বিশ্বে যত মানুষের লিভার ক্যান্সার হয় তার ৮০ ভাগ ক্ষেত্রেই দায়ী হচ্ছে এই হেপাটাইটিস বি ও সি ভাইরাস। পৃথিবীতে গড়ে প্রতিদিন ৪ হাজার মানুষ লিভার রোগে মারা যায়। শরীরে হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের উপস্থিতি আছে কি না, এটা জানতে একজন পরিপাকতন্ত্র ও লিভার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হয়। চিকিৎসক নানা দিক পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পরামর্শ দেন। এখানে বলে রাখা ভালো, এই রোগের চিকিৎসা ও ফলোআপ সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি হয়ে থাকে। অনেকের ক্ষেত্রে সারাজীবন চিকিৎসা নেওয়ারও প্রয়োজন হতে পারে। কোনো ব্যক্তি এই ভাইরাস বহন করছেন জানতে পারলে তার উচিত পরিবারের অন্য সদস্যদের বিশেষ করে মা-বাবা, ভাইবোন ও সন্তানদের শরীরে এই ভাইরাস আছে কি না, সেটাও জেনে নেওয়া। কারণ, যাদের শরীরে এ ভাইরাস নেই, তারা টিকা দিয়ে খুব সহজেই এই ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন। কোনো গর্ভবতী নারী যদি হেপাটাইটিস বি ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে থাকেন, তার অবশ্যই গর্ভকালীন গাইনি এবং পরিপাকতন্ত্র ও লিভার বিশেষজ্ঞের অধীনে চিকিৎসা নিতে হবে। সন্তান প্রসব অবশ্যই হাসপাতালে হতে হবে। কারণ, এ সময় মায়ের কাছ থেকে তার গর্ভের সন্তানের শরীরে এই ভাইরাস চলে যেতে পারে। সে জন্য সন্তান জন্মানোর পরে সন্তানকে এই ভাইরাস প্রতিরোধে দ্রুত টিকা দিয়ে দিতে হবে।

হেপাটাইটিস লিভারের রোগ, এতে লিভার দুর্বল হয়ে পড়ে। লিভার দুর্বল হয়ে গেলে হজমও ঠিকমতো হয় না। সেখান থেকে আসে আরও একাধিক সমস্যা। তাই হেপাটাইটিস হলে খাবার আর পানীয় বিষয়ে বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয়। কোনো ভাবেই যাতে হজমে ব্যাঘাত না ঘটে সেদিকে নজর রাখতে হবে। বাইরের খাবার, তেল-মশলাদার খাবার একেবারেই খাওয়া যাবে না। বাড়ির তৈরি খাবার খেতে হবে। সেই সঙ্গে বাইরের পানি খাওয়া যাবে না। কী খাচ্ছেন সেই ব্যাপারে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। না হয় মারাত্মক আকার নিতে পারে হেপাটাইটিস। ফাইবার, ফোলেট, ভিটামিন এ, সি, বি ৬ এসব অবশ্যই খাদ্য তালিকায় রাখতে হবে। এছাড়াও পটাশিয়ামসমৃদ্ধ খাবার, ফল, শাকসবজি, টমেটো, দুধ, পালং শাক, ব্রকোলি, মিষ্টি আলু, স্ট্রবেরি বা ভিটামিন সি জাতীয় ফল, কমলা লেবু, কলা, এপ্রিকট, খেজুর, টকদই এসব রাখুন প্রতিদিনের ডায়েটে। এছাড়াও প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। আর লিভার সিরোসিস হলে এমন কিছু খাবার খেতে হবে যার মধ্যে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি থাকে। এছাড়াও দুধ, দই, পনির এসবও রাখুন ডায়েটে। এসব ক্যালশিয়ামসমৃদ্ধ খাবার প্রোটিনের খুব ভালো উৎস। পানি, ডাবের পানি নিয়মিত বেশি পরিমাণে খেতে হবে।

হেপাটাইটিস ভাইরাসের আক্রমণ ঘটলে যকৃতের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। এর ফলে রক্তে বিলিরুবিনের পরিমাণ বেড়ে যায়। সারা দেহে হলদেটে ভাব আসে। হেপাটাইটিসগুলোর মধ্যে সব থেকে বিপজ্জনক হিসেবে ধরা হয় বি এবং সি ক্যাটাগরির ভাইরাস আক্রান্তদের। হেপাটাইটিস বি ও সি-এর চিকিৎসা ঠিকমতো না হলে, তা বিপজ্জনক দিকে গড়াতে পারে। সময়মতো রোগের চিকিৎসা না হলে, ক্রনিক হেপাটাইটিস থেকে হতে পারে সিরোসিস অব লিভার বা লিভারের ক্যান্সারও। পরিসংখ্যান বলছে, সারা বিশ্বে এখন প্রায় ৩২৫ মিলিয়ন মানুষ হেপাটাইটিসে আক্রান্ত। বাংলাদেশ সরকার সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচিতে এই ভাইরাসের টিকা অন্তর্ভুক্ত করেছে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে এই ভাইরাসের আক্রমণ থেকে আমরা অচিরেই মুক্তি পাব। হেপাটাইটিস বি-এর ভ্যাকসিন ডোজ ৪টি। প্রথম ৩টি একমাস পরপর এবং ৪র্থটি প্রথম ডোজ থেকে এক বছর পর। পাঁচ বছর পর বুস্টার ডোজ নিতে হয়। এর মাধ্যমে শরীরে হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের বিপক্ষে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার। ২০৩০ সালের মধ্যে ৯০ শতাংশ শিশুর হেপাটাইটিস বি টিকা নিশ্চিত করতে চায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। নবজাতক শিশুকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হেপাটাইটিস প্রতিরোধে বার্থ ডোজ দেওয়া প্রয়োজন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার টার্গেট অনুযায়ী লক্ষ্য পূরণে বাংলাদেশ কাজ করছে। হেপাটাইটিস রোগ নিয়ে সরকার অত্যন্ত সচেতন। এ রোগের ক্ষেত্রে সরকারের কর্মপরিকল্পনা আছে। নিয়মিত সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছে টিকা। এছাড়া জন সচেতনতা সৃষ্টিতে চালানো হচ্ছে প্রচারণা।

ফাতেমা আক্তার: প্রাবন্ধিক

৪১ জন খামারি ও উদ্যোক্তা পেলেন ডেইরি আইকন পুরস্কার

দুধ উৎপাদন বৃদ্ধিতে খামারি ও উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে দুগ্ধ খাতে সফল দেশের ৪১ জন খামারি ও উদ্যোক্তাকে ডেইরি আইকন পুরস্কার ২০২২ প্রদান করা হয়েছে। বিশ্ব দুগ্ধ দিবসের কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে দ্বিতীয় বারের মতো ৪টি ক্যাটাগরিতে এ পুরস্কার প্রদান করে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। এর মধ্যে ডেইরি ক্যাটাগরিতে ২০ জন, দুধ ও মাংস প্রক্রিয়াকরণে ৯ জন, পশুখাদ্য প্রক্রিয়াকরণে ৮ জন এবং খামার যান্ত্রিকীকরণে ৪ জনকে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রতিটি পুরস্কারের আর্থিক মূল্য এক লাখ টাকা। সেই সাথে প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছে ক্রেস্ট ও সনদ। ১লা জুন রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ মিলনায়তনে বিশ্ব দুগ্ধ দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন ও ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন অনুষ্ঠানে এ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. এমদাদুল হক তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু, স্থায়ী কমিটির সদস্য শহীদুল ইসলাম বকুল, স্থায়ী কমিটির সদস্য ছোট মনির এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-গবেষকবৃন্দ এবং ডেইরি খাতের উদ্যোক্তাগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন: জেসিকা হোসেন

সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়

সুব্রত কুমার

‘বন্ধু’ শব্দটি ছোটো, কিন্তু এর গভীরতা অনেক। বন্ধুত্ব হলো মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিশেষ সম্পর্ক। আত্মার শক্তিশালী বন্ধন। বন্ধুত্বের জন্য কোনো নির্দিষ্ট দিনক্ষণ লাগে না। বন্ধুত্বের কোনো বয়সসীমা নেই। এজন্যই বন্ধুত্বের ব্যাপ্তি সীমাহীন। সমবয়সিরাও যেমন বন্ধু হতে পারে, তেমনি বয়সে ছোটো-বড়োরাও বন্ধু হতে পারে। ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ডেটাবেজ গবেষণায় দেখা গেছে যে, ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের কারণে মানুষ সুখী হয়। এজন্য সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতার সম্পর্ক রাখা উচিত নয়।

৩০শে জুলাই বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস। মানুষ, দেশ, সংস্কৃতি এবং ব্যক্তিদের মধ্যে বন্ধুত্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করতে পারে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সেতু তৈরি করতে পারে– এই ধারণা নিয়ে ২০১১ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ দ্বারা ৩০শে জুলাই আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব দিবস ঘোষণা করা হয়েছিল। জাতিসংঘের বন্ধুত্ব দিবস সম্পর্কিত রেজ্যুলেশনে তরুণদের ভবিষ্যতের নেতা হিসেবে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস পালন এমন একটি উদ্যোগ যেখানে ইউনেসকোর প্রস্তাব অনুসরণ করে– শান্তির সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, মনোভাব এবং আচরণের একটি সেট হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যেখানে সহিংসতা প্রত্যাখ্যান এবং সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে মূল কারণগুলো চিহ্নিত করে তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। এটি ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ বিভিন্ন দেশের সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং নাগরিক সমাজের গোষ্ঠীগুলোকে ভ্রাতৃত্ববোধের উন্মেষ ঘটানো এবং এ জাতীয় উদ্যোগ আয়োজনের জন্য উৎসাহিত করে; যা সভ্যতা, সংহতি, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং পুনর্মিলনের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় একত্র করতে অবদান রাখে।

বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস পালনের মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে কিছু দায়িত্ব ও উদ্দেশ্য, যেগুলো ত্বরান্বিত করবে আগামীর তরুণ প্রজন্ম। যেমন: আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রচার; অংশগ্রহণমূলক যোগাযোগ এবং তথ্য ও জ্ঞানের অবাধ প্রবাহ সমর্থন; অগ্রিম বোঝাপড়া, সহনশীলতা এবং সংহতি; গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা; নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা নিশ্চিত করা; সকল মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রচার করা; টেকসই অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন প্রচার; শিক্ষার মাধ্যমে শান্তির সংস্কৃতি গড়ে তোলা ইত্যাদি।

মানুষ যুগ যুগ ধরে বন্ধুত্বকে উদ্‌যাপন করে আসছে। বন্ধুত্ব দিবসের উৎপত্তি কোথায়, কীভাবে তার কোনো সঠিক তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায় না। তবে প্রচলিত এক সূত্র অনুযায়ী জানা যায়, সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যেই বন্ধুত্ব দিবসের প্রচলন শুরু হয়েছিল। ১৯৩০ সালে এই কাজটি করেছিলেন বিশ্বখ্যাত উপহারসামগ্রী ও কার্ড বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান হলমার্কের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জয়েস হল। তিনি প্রতিবছর ২রা আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রে বন্ধুত্ব দিবস উদ্‌যাপনের বিষয়টি সামনে আনেন। এদিন কার্ড আদান-প্রদানের মাধ্যমে বন্ধু দিবস পালন করার প্রচলন শুরু হয়। ১৯৪০ সাল নাগাদ মানুষ বুঝতে পারে এটা হলমার্কের কার্ড ব্যাবসা বাড়ানোর ফন্দি। এরপর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বন্ধু দিবস উদ্‌যাপন একরকম বন্ধই হয়ে যায়। তবে ইউরোপ-এশিয়ার বিভিন্ন দেশে একসময় ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে বন্ধু দিবস উদ্‌যাপনের রেওয়াজ। পরবর্তীতে ১৯৫৮ সালে প্যারাগুয়ের চিকিৎসক র‍্যামন আর্থেমিও ব্রেচ ২০শে জুলাই বিশ্বব্যাপী বন্ধু দিবস পালনের প্রস্তাব দেন। এরপরই বিশ্বব্যাপী ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বন্ধুত্ব, ঐক্য ও ভালোবাসা ছড়িয়ে দিতে গঠন করা হয় ‘বন্ধুত্ব ক্রুসেড’। কালক্রমে বন্ধুত্ব দিবস পালনের বিষয়টি জাতিসংঘের দৃষ্টিগোচর হয় এবং ২০১১ সালে সর্বসম্মতিক্রমে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ৩০শে জুলাইকে বন্ধুত্ব দিবস ঘোষণা করে।

বন্ধুত্ব দিবস শুধু ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির কিংবা গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়। একটা রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যেও বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক বিদ্যমান হতে পারে। যেমন আমাদের বাংলাদেশ। বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস নিয়ে এ লেখায় বাংলাদেশ এবং এর প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা বাঞ্ছনীয়। পৃথিবীর ইতিহাসে বাঙালি ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বহির্বিশ্বের প্রতি বন্ধুত্বের নজির বিশ্ব স্বীকৃত। বাঙালি জাতির পিতা, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও শান্তি আন্দোলনের পুরোধা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশেরই একজন কৃতি সন্তান। তাঁর তর্জনী সম্বলে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছিল।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালিদের অনুসরণীয় এক আদর্শবান ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন বন্ধুসুলভ একজন মানুষ। দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামী জীবনে বাংলাদেশের জাতীয় চার নেতা– সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনসুর আলী এবং এএইচএম কামারুজ্জামান ছিলেন বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাজন। বঙ্গবন্ধু তাঁদেরকে ভাই-বন্ধুর মতো দেখতেন। যে-কোনো দলীয় সিদ্ধান্তে তাঁদের সামিল করতেন। এটাই হলো সত্যিকারের বন্ধুত্বের নিদর্শন। বঙ্গবন্ধু সব সময় মাটি ও মানুষের কথা ভাবতেন। আর তাই তাঁর নেতৃত্বেই ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ অগণতান্ত্রিক স্বৈরশাসক পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। যুদ্ধ-পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড় করানোর জন্য বঙ্গবন্ধু বহির্বিশ্বের সঙ্গে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ‘সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়’– ছিল বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি। আর এটা অনুসরণ করেই বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়েছিলেন। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তিনি সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার আহ্বান জানান।

‘সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়’– জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক এ উক্তি জাতিসংঘ

সাধারণ পরিষদে গৃহীত 'ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অব ডায়ালগ অ্যাজ এ গ্যারান্টি অব পিস ২০২৩' শীর্ষক রেজ্যুলেশনে ইতোমধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ বিষয়ে ৭ই ডিসেম্বর ২০২২ ঢাকায় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, কোভিড-১৯ পরবর্তী বিশ্ব ব্যবস্থা এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সাধারণ পরিষদের প্লেনারিতে রেজ্যুলেশনটি উত্থাপন করে তুর্কমেনিস্তান। পরে সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়। বিশ্বমানবতা ও বিশ্বশান্তির অন্যতম প্রবক্তা বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক উক্তিটি প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের রেজ্যুলেশনে সন্নিবেশিত হয়। রেজ্যুলেশনটির চতুর্দশ অনুচ্ছেদে যুক্ত বঙ্গবন্ধুর উক্তিটি যেভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে, তা হলো– 'দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ, নিরক্ষরতা এবং বেকারত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের গুরুত্ব স্বীকার করে এবং গঠনমূলক সহযোগিতা, সংলাপ এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার চেতনায় সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং কারও প্রতি বিদ্বেষ নয় মর্মে জোর দেওয়া হলে তা এই উদ্দেশ্যগুলো অর্জনে সহায়তা করবে।' ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেওয়ার সময় জাতির পিতা যে বিষয়গুলোর ওপর জোর দিয়ে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন, সেগুলোর ধারণামূলক ভিত্তি হতে এ অনুচ্ছেদটির প্রস্তাবনা তৈরি করা হয়। রেজ্যুলেশনটিতে দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশসহ ৭০টি দেশ কো-স্পন্সর করে।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ১০ই অক্টোবর ১৯৭২ ফিনল্যান্ডের হেলসিংকিতে বিশ্বশান্তি পরিষদ এক ইশতেহারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিশ্বশান্তি পরিষদের সর্বোচ্চ সম্মান 'জুলিও কুরি' শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করে। ১৯৭৩ সালের ২৩শে মে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রদান করেন বিশ্বশান্তি পরিষদের সেক্রেটারি জেনারেল রমেশ চন্দ্র। এটি ছিল বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। আর এই পদক ছিল বাংলাদেশের জন্য প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মান। এ মহান অর্জনের ফলে জাতির পিতা পরিণত হয়েছেন বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধুতে। এছাড়া ২০১৯ সালের ১৫ই আগস্ট জাতিসংঘ সদর দফতরে বঙ্গবন্ধুর ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বিশ্ববন্ধু' (ফ্রেন্ড অব দ্য ওয়ার্ল্ড) হিসেবে আখ্যা দেন সংস্থাটির সাবেক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ও জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত আনোয়ারুল করিম চৌধুরীসহ বৈশ্বিক কূটনীতিকেরা। বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়া এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশ্বনেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে এ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও তাঁর পিতার দেখানো পথ অনুসরণ করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ২৮শে জানুয়ারি ২০২১ সালে প্রধানমন্ত্রী এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, জাতির পিতা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল মন্ত্র দিয়ে গেছেন, তা হলো– 'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়'। এই নীতিমালা অনুসরণ করেই আমরা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সুসম্পর্ক বজায় রেখে এগিয়ে যাচ্ছি। এছাড়াও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী সবার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক বজায় রাখার আহ্বান জানান। বর্তমানে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ঐক্য উন্নয়নে বাংলাদেশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও গৌরবময় ভূমিকা রাখছে। বহির্বিশ্বের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং বিপদে পাশে থাকতে বাংলাদেশ জাতিসংঘে সর্বোচ্চ শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণকারী দেশ। এসব পর্যালোচনা থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ও বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের দৃঢ় অবস্থান।

'বন্ধুত্ব' ব্যাপারটা সব সম্পর্কের ক্ষেত্রেই প্রয়োজন। বন্ধুত্ব সম্পর্ককে সহজ করে। আর তাই পিতা-মাতার সঙ্গেও বন্ধুত্ব হওয়া জীবনে বেশি জরুরি। মনের সঙ্গে মনের মিল হলেই শুধু সত্যিকারের বন্ধুত্ব হয়। বন্ধুত্বে অহংকার ও হিংসার স্থান নেই। 'বন্ধুত্ব' এমন একটা বিষয়, যা অনেক ক্ষেত্রে জীবনের চেয়েও দামি হয়ে দাঁড়ায়। এমন নজির পৃথিবীতে বহু আছে। বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবসে সবাই একে অপরের প্রতি শুভেচ্ছা বিনিময়, গিফট, ঘোরাঘুরি, খাওয়াদাওয়া, বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্যে দিয়ে পালন করে। তবে আজকাল ভালো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সংখ্যা কম। এ সময়ে সত্যিকারের বন্ধু পাওয়া বা থাকা দুটোই ভাগ্যের ব্যাপার। মনে রাখতে হবে, যে-কোনো সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিচর্যার কোনো বিকল্প নেই। একপাক্ষিক কোনো কিছুই মজবুত হয় না। অবহেলা যে-কোনো সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট। তাই আসুন আমরা বন্ধু বানাই, বন্ধুত্বকে উদ্‌যাপন করি। প্রতিটি দিন হোক বন্ধুত্ব দিবস। পৃথিবীর সব মানুষের বন্ধুত্ব অটুট থাকুক। সবার বন্ধুরা ভালো থাকুক।

সুব্রত কুমার: প্রাবন্ধিক

রাজনীতিক, কূটনীতিকদের সম্মানে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

বিশিষ্ট রাজনীতিক, বিদেশি কূটনীতিক, সংস্কৃতি ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বদের সম্মানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী আয়োজিত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ২২শে জুলাই ঢাকা ক্লাবের স্যামসন এইচ হলে অনুষ্ঠিত হয়। মনোরম এ আয়োজনে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ এবং তাঁর সহধর্মিণী নুরান ফাতেমা অতিথিদের অভ্যর্থনা জানান।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, ভূমিমন্ত্রী এম সাইফুজ্জামান চৌধুরী, সংসদ সদস্য সাইমুম সরওয়ার কমল, প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক, আব্দুর রহমান, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন প্রমুখ অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

হাইকমিশনারদের মধ্যে ভারতের প্রণয় কুমার ভার্মা, যুক্তরাজ্যের সারাহ কুক, রাষ্ট্রদূতদের মধ্যে জাপানের ইওয়ামা কিমিনোরি, ইউরোপীয় ইউনিয়নের চার্লস হুইটলি, সৌদি আরবের ইসা বিন ইউসুফ আল দাহিলান, ফ্রান্সের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স গুইলমে অন্দ্রে দো কেন্দ্রেল প্রমুখ আয়োজনে উপস্থিত হন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন, তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার, বিটিভির মহাপরিচালক ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব নাঈমুল ইসলাম খান, নঈম নিজাম, সন্তোষ শর্মা, নাসিমা খান মন্টি, অভিনয়শিল্পী অরুণা বিশ্বাস, আরেফিন শুভ, নুসরাত ফারিয়া প্রমুখ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তুষ্টি ও নেহরীনের উপস্থাপনায় কোনাল, অনুপমা মুক্তি, মেহরাব, সাব্বির প্রমুখ শিল্পীদের সংগীত পরিবেশনার সাথে নৈশভোজে অংশ নেন অতিথিবৃন্দ।

প্রতিবেদন: এইচ কে রায় অপু

চা শিল্পে বঙ্গবন্ধুর অবদান এবং জাতীয় চা পুরস্কার

ফায়েজা খানম

চা বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। সুদীর্ঘ ১৮০ বছর ধরে বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে চা শিল্প গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। যাঁর নাম এ শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তিনি হলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ১৯৫৭ সালের ৪ঠা জুন থেকে ১৯৫৮ সালের ২৩শে অক্টোবর পর্যন্ত চা বোর্ডের প্রথম বাঙালি চেয়ারম্যান ছিলেন। এ সময় দায়িত্ব পালনকালে চা শিল্পের উন্নয়নে তাঁর দিক নির্দেশনায় ১৯৫৭ সালে শ্রীমঙ্গলে চা গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং ঢাকার মতিঝিলে চা বোর্ডের কার্যালয় স্থাপিত হয়। চা শিল্পে জাতির পিতার অবদান এবং চা বোর্ডে যোগদানের তারিখকে স্মরণীয় করে রাখতে ২০২০ সালের ২০শে জুলাই অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে ৪ঠা জুনকে 'জাতীয় চা দিবস' ঘোষণা করা হয়।

৪ঠা জুন ২০২৩ বর্ণাঢ্য আয়োজনে জাতীয় চা দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপিত হয়। দেশের চা শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসার ঘটিয়ে বিশ্ব দরবারে ব্র্যান্ডিং করতে চায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় চা বোর্ডের উদ্যোগে তৃতীয়বারের মতো দিবসটি উদ্‌যাপনের আয়োজন করা হয়েছে। এবারের প্রতিপাদ্য– 'চা দিবসের সংকল্প, শ্রমিকবান্ধব চা শিল্প'। দিবসটি উপলক্ষে পৃথক বাণী দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

দেশে তৃতীয়বার দিবসটি পালিত হলেও এবারই প্রথমবারের মতো 'জাতীয় চা পুরস্কার ২০২৩' প্রদান করা হয়। মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে বিটিআরআই উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত 'তৃতীয় জাতীয় চা দিবস উদ্‌যাপন ও ১ম জাতীয় চা পুরস্কার' প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ নজরদারি এবং নানামুখী উদ্যোগের ফলে দেশের চা খাত আজ টেকসই ও মজবুত অবস্থানে এসেছে। গুণগত ও মানসম্পন্ন চা উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা কার্যক্রম জোরদারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

বাণিজ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন শ্রমিকবান্ধব নেতা। গরিবদুঃখী, মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ে সারাজীবন আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন। চা শিল্পের সঙ্গে প্রায় দেড় লাখ শ্রমিক, যার অর্ধেকের বেশি নারী শ্রমিক নিয়োজিত আছে। এ শিল্পের সঙ্গে তাদের ভাগ্য জড়িয়ে আছে। নারী-পুরুষ উভয় শ্রমিকদের কল্যাণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি আরও বলেন, যে-কোনো শিল্পের প্রাণ হচ্ছে শ্রমিক। অতএব তাদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, চা শ্রমিকদের বেতন নিয়ে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজ দায়িত্বে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করে দিয়েছেন এবং শ্রমিকরা তা নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন। 'জাতীয় চা পুরস্কার' চা শিল্পের বিকাশ ও অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান করতে অনুপ্রাণিত করবে বলে জানান তিনি। চায়ের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি, বিপণন প্রক্রিয়ায় আধুনিকায়ন এবং সর্বোপরি অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশি চায়ের নতুন বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার পথ তৈরি করতে হবে।

উক্ত অনুষ্ঠানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক চিফ হুইপ উপাধ্যক্ষ ড. মো. আব্দুস শহীদ, এমপি। বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো. আশরাফুল ইসলাম অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। এছাড়া এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন, টি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি শাহ মঈনুদ্দিন হাসান এবং বাংলাদেশের চা সংসদের সভাপতি কামরান টি রহমান অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন। পরবর্তীতে বাণিজ্যমন্ত্রী চা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত চা মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন।

৮ ক্যাটাগরিতে 'জাতীয় চা পুরস্কার ২০২৩' পেলেন ২ ব্যক্তি ও ৬ প্রতিষ্ঠান: জাতীয় চা দিবসের অনুষ্ঠানে দেশের চা শিল্পে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বছর প্রথমবারের মতো ২ ব্যক্তি ও ৬ প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় চা পুরস্কার ২০২৩ প্রদান করা হয়। বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি পুরস্কার প্রাপ্তদের হাতে ট্রফি ও সনদ তুলে দেন। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলো:

(১) একর প্রতি সর্বোচ্চ উৎপাদনকারী চা বাগান– ভাড়াউড়া চা বাগান
(২) সর্বোচ্চ গুণগত ও মানসম্পন্ন চা উৎপাদনকারী বাগান– মধুপুর চা বাগান
(৩) শ্রেষ্ঠ চা রপ্তানিকারক– আবুল খায়ের কনজ্যুমার প্রোডাক্টস লি.
(৪) শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্রায়তন চা উৎপাদনকারী– মো. আনোয়ার সাদাত সম্রাট (পঞ্চগড়)
(৫) শ্রমিক কল্যাণের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ চা বাগান– জেরিন চা বাগান
(৬) বৈচিত্র্যময় চা পণ্য বাজারজাতকরণের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ কোম্পানি– কাজী অ্যান্ড কাজী টি এস্টেট লি.
(৭) দৃষ্টিনন্দন ও মানসম্পন্ন চা মোড়কের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ চা কোম্পানি– গ্রিন ফিল্ড টি ইন্ডাস্ট্রিজ লি.
(৮) শ্রেষ্ঠ চা পাতা চয়নকারী (চা শ্রমিক)– উপলক্ষী ত্রিপুরা, নেপচুন চা বাগান।

ফায়েজা খানম: প্রাবন্ধিক

মাটির গন্ধ

রফিকুর রশীদ

পুবের আকাশ তখনও ফর্সা হয়নি। অন্ধকার চারদিকে শক্ত দেয়াল তুলে দাঁড়িয়ে আছে। দৃশ্যমানতার আড়াল থেকে ভয়াল দৈত্য দুহাত বাড়িয়ে আলোর শিখার টুঁটি টিপে ধরতে চায়। উঠোনের কোণে কুয়াশাভেজা উনুনে লাকড়ি ঠেলে দিয়ে মরিয়ম একবার ঘাড় উঁচিয়ে তাকায় আকাশের দিকে– নাহ, অন্ধকার তখনও অনড়। ফাল্গুনের শেষ রাতে গা-শিরশিরানো ঠান্ডা সামলাতে একবার সে শাড়ির আঁচল ঘুরিয়ে শরীর পেঁচিয়ে নেয়, তারপর উনুনের কম্পমান শিখার দিকে তাকিয়ে মনে মনে জিভ ভেংচি কাটে আর একা একা ঠোঁট তড়পায়– আন্ধার দেইখি তুইও ভয়-তড়াশে মরিস! অ্যাঁ?

ভোররাতে উঠে উনুন জ্বেলে ভাত চাপানো নতুন কিছু নয়, মরিয়মের নিত্যদিনের কাজ। শীত-গ্রীষ্মের তফাৎ নেই, দম দেওয়া ঘড়ির কাঁটার মতো প্রায় প্রতিদিনই শেষরাতের নির্দিষ্ট এক প্রহরে তার তলপেট টনটন করে টাটিয়ে ওঠে। তখন তাকে শয্যা ত্যাগ করতেই হয়। ঝাঁপ ঠেলে ঘরের বাইরে এসে প্রথমে ভারমুক্ত হওয়া, তারপর উঠোনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের নিভানো উনুনের মুখে আগুন দেওয়া– এভাবেই শুরু হয় মরিয়মের দিনযাপন। উনুনে লাকড়ি ঠেলতে ঠেলতেই সে ঘাড় কাৎ করে আকাশ দেখে। আকাশের ওড়নায় হেলে পড়া সাত ভাই চম্পা খোঁজে। শাকসবজি, আনাজপাতি মিলিয়ে তরকারি কোটে, এরই মাঝে মসজিদের মাইক্রোফোন থেকে ইথার কাঁপানো কণ্ঠে মন্দ্রিত হয় ভোরের আজান। সারা দিনে একাধিক মসজিদের আজান শোনার সুযোগ হয় মরিয়মের, একই সুরে বাঁধা উচ্চারণ হওয়া সত্ত্বেও এই প্রভাতী আজানের মধ্যে কী যেন এক ভিন্নতা খুঁজে পায় সে। কী সেই ভিন্নতা? চুলচেরা বিশ্লেষণের ক্ষমতা নেই তার, শুধু মনে হয় আলাদা কিছু। মনে হয় যেন সে নদীপাড়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর জোয়ারের উঁচু ঢেউ প্রবল গর্জনে আছড়ে পড়ছে। এই আছড়ে পড়া ধ্বনিতরঙ্গে কেঁপে ওঠে তার অন্তরের নিভৃত প্রদেশ পর্যন্ত। তখন সে কী করে! উঠোন থেকে উঠে আসে ঘরে। ঘোর ঘোর অন্ধকারের মধ্যেই সে বৃদ্ধ স্বামীর বিছানা হাতড়ায়। কী যেন বুঝতে চায়। তারপর তার বগলের তলে দুহাত লাগিয়ে দাঁড় করিয়ে হাতের লাঠি এগিয়ে ধরে জানতে চায়,

– কাপড়চোপড় নষ্ট হয়নি তো আজ?

বয়সের ভারে ন্যুব্জ ইনসান আলী পেচ্ছাপের উপরে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না বলে প্রায়শ পরনের কাপড়চোপড়, বিছানাপত্র নোংরা করে ফেলে এবং এজন্যে বিবাহিতা স্ত্রী মরিয়মের সামনেও খুব লজ্জা পায়। হোক তিন নম্বর স্ত্রী, তবু স্বামী হিসেবে সে তো কর্তৃত্ব ফলাতেই পারে; কিন্তু কী যেন এক অব্যাখ্যেয় কারণে সারা দিন আপন বৃত্তে লেজ গুটিয়ে বসে থাকে।

এই ভোরবেলাটায় মরিয়মের হাতে খুব সময়ের টান। দুহাতে সব কাজ কুলিয়ে ওঠা দায়। এদিকে-সেদিকে তাকাবার উপায় আছে! বৃদ্ধ স্বামীর পরনের কাপড়চোপড় পাল্টেপুল্টে দিয়ে অজু করিয়ে নামাজে বসিয়ে দেয়। বেশ কিছুদিন থেকে সকাল-সন্ধ্যা দুবেলা নামাজের খুব টান হয়েছে লোকটার। মরিয়ম সাধ্যমতো সহযোগিতা করে। তোলা শাড়ির আঁচল বিছিয়ে জায়নামাজ বানিয়ে সেইখানে বসিয়ে মাথায় টুপি পরিয়ে দেয়। তার নামাজ মানে অনুচ্চারিত দোয়াদরুদে কেবল ঠোঁটজোড়া তড়পানো। নামাজ শেষ হলে ভাপ ওঠা গরম ভাত এনে তাকে খাওয়ায়। তারপর নিজে দুমুঠো নাকেমুখে গুঁজে মাটিকাটা ঝুড়ি হাতে বেরিয়ে পড়ে মরিয়ম।

কোথায় কবে কেমন কাজ, কতদূরে কীভাবে যেতে হবে– এসব নিয়ে মরিয়মের কোনো ভাবনা নেই। সে দায়িত্ব এ লাইনের সর্দারের এবং জোড়ের সাথির। মাটি কাটার জগতে প্রবেশের সময় এই জোড়ের সাথি ব্যাপারটা বুঝে ওঠার পর নীচের ঠোঁট দাঁতে চেপে মনে মনে বলেছে মরিয়ম– তার মানে জোড়মানিক। ঘরের বাইরে বেরিয়ে পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরাও এখন কৃষিকাজ করছে, রাজমিস্ত্রির জোগাল দিচ্ছে, ইট ভাঙছে, এমনি ধারা আরও কত কী! তাই বলে মাটিকাটার কাজে এ কী বিদঘুটে নিয়ম! যে-কোনো পুরুষের সঙ্গে জোড় বাঁধতেই হবে, কাজের সময় সে-ই তাকে চালিয়ে ফিরিয়ে নেবে। এই জোড় দীর্ঘদিন স্থায়ী না হলেও ক্ষতি নেই, এক জোড় ভেঙে নতুন জোড় বাঁধাও দোষের কিছু নয়, জোড়মানিক একটা কেউ থাকতেই হবে।

এটাই প্রচলিত রীতি। সর্দারের মতো রাক্ষুসে থাবা বাড়িয়ে উপার্জিত অর্থে ভাগ বসায় না ঠিকই, কিন্তু দৃশ্যের আড়ালে এই জোড়মানিকেরা আরও অনেক কিছুতেই। এ জগতে রাখ-ঢাকের বিশেষ বালাই নেই, সবাই জানে ভেতরে-বাইরের সব কিছু। ছোটোবেলার সেই পুকুরপাড়ার ছামেনা যখন পুরানো জোড় ভেবে বাঁশবাড়িয়ার জলিল ফারাজির সঙ্গে নতুন জোড় বাঁধে, তখন কত অবলীলায় মরিয়মের কাঁখে মাটির ঝুড়ি তুলে দিয়ে বলতে পারে– নে সই, আমার পুরানো জোড়ের সাথি ইনুচকে দিয়ি দিলাম; কাজের অভাব হবে না তোর।

তা ঠিক। অচিরেই টের পেয়েছে মরিয়ম, গাঁট্টাগোট্টা শক্তসমর্থ শরীর-স্বাস্থ্যের জন্যে ইনুচের কদর সব সর্দারের কাছেই। কাজপাগল পরিশ্রমী মানুষ, ফাঁকিজুকি কাকে বলে তা জানে না। নিজেও খাটতে পারে, জোড়ের সাথিকেও খাটিয়ে নিতে পারে। খেটেখুটে সামান্য রোজগারের জন্যেই তো ঘর ছেড়ে বাইরে বেরুনো। যার সঙ্গেই জোড় বাঁধা হোক, খাটতে তো হবেই। কোদাল দিয়ে মাটি কেটে ঝুড়ি ভরে ইনুচ যেদিন প্রথম ঝুড়িটি তুলে দেয় মরিয়মের মাথায়, সেই প্রথম দিনেই অমন শক্তপোক্ত জোয়ানমর্দ লোকটির চোখের গভীরে অকপট সারল্য আবিষ্কার করে বসে মরিয়ম। কিন্তু সেটা কি ইনুচ ধরতে পারে! নইলে দুপুরে গাছের ছায়ায় বসে জলখাবার খাওয়ার সময় এভাবে সে বলে কী করে– চোখের মধ্যি চোখ ঢুকিয়ি দিয়ি কী দেখিস তুই?

মরিয়মও কম যায় না। ছামেনার কাছে থেকে আগেই শিখে রেখেছে এসব জায়গায় মুখের দাপট কিছুতেই কমালে চলবে না। সমানে সমান না হোক উনিশ-কুড়ির বেশি তফাৎ হলে চলবে না। সেই গুরুবাক্য শিরোধার্য করে সেও মুখের উপরে সপাং করে ঝেড়ে দেয়,

– তুমার নজর কুন দিকি, তা আমি জানিনি?

– নির্ব্বিবাদী মানুষটা রুষে ওঠে,

– কুন দিকি?

– আবার কনে!

– ইনুচের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তবু মাথা ঠান্ডা রেখে মুখে কটাক্ষের গরল ঢেলে দেয়,

– আধবুড়ি মাগির আবার বুক-ফুলানি গর্ব!

– 'আধবুড়ি' শব্দটির ধাক্কায় অথবা অন্য যে কারণেই হোক মরিয়ম সহসা চুপসে যায়। মনে মনে নিজেকে বুঝ দেয়, আধবুড়ি বই কী! তারই পেটের মেয়ে ময়নার বিয়ে হয়েছে বছর দুই হয়ে গেল, নাতিপুতি হতেই বা কদ্দিন! প্রথম পক্ষের খোকাটা বেঁচে থাকলে সেও অ্যাদ্দিন কত সেয়ানা হয়ে যেত! আয়-উপার্জন করতে শিখত নিশ্চয়ই। অভাব যতই থাক, সেই ছেলে কি তার মাকে মাটি কেটে রোজগার করতে দিত! দীর্ঘশ্বাস পড়ে মরিয়মের বুক চিরে – বাব্বা, মেঘে মেঘে এত বেলা গড়িয়ে গেল!

– বাবরাতলার ছায়া থেকে ছামেনা এগিয়ে এসে মুখচাপা দিয়ে ধরে,

– কী রে সই, মন ভার ক্যানে?

– মরিয়ম স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করে,

– কই, না তো!

– 'না তো' বুললি হবে! সত্যি সত্যি কী হয়িচে তাই বোল দিনি।

– মুখে কুলুপ এঁটে থাকে মরিয়ম। ছামেনা মুখ ঝামটা দেয় তাকে,

– তোকে তো আমি আগেই বুইলিচি, মাটিকাটা অতো সোজা কাজ ন। কত পুরুষ মানুষ জিভ কেলিয়ি হেদিয়ি যায়। তুই তালি ইখানে আলি ক্যানে, অ্যাঁ?

– মরিয়ম সব কিছু শোনার পর জেনেবুঝেই এ পথে পা বাড়িয়েছে। নাহ, এজন্যে আবার অভিযোগ কীসের! যেমনই হোক, কাজকর্ম একটা কিছু না করলে মুখের আহার জুটবে কী করে! একমাত্র কন্যার বিয়ের পরও তো সে ঝাড়া হাত-পা, মুক্ত মানুষ হতে পারেনি। তার মাথার উপরে বটবৃক্ষ হয়ে আছে বৃদ্ধ স্বামী, তার কথা ভাবতে হবে না? যার ছায়া নেব, তার দিকটা না দেখলে চলে?

– মরিয়মকে ছেড়ে ছামেনা এতক্ষণে চেপে ধরে ইনুচকে, সোজা তার চোখে চোখ রেখে জানতে চায়, কী বুইলিচ আমার সইকে?

– ইনুচ চোখ সরিয়ে নেয়, কিন্তু কোনো উত্তর দেয় না। মুখে গজর গজর করে ছামেনা– নতুন একটা মানুষ আয়িচে দলে, তাকে একটু থিতু হয়ি দাঁড়াতি দ্যাও, সব কিছু বুঝতি দ্যাও, তারপর না হয় হাত বাড়ায়ু।

– কী ভ্যাজর ভ্যাজর কত্তি আলি তুই? ইনুচ হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে হাতের আঙুলে গোঁজা আধপোড়া বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চিৎকার করে ওঠে– তোর সইকে শুধিয়ি দ্যাখ দিনি– কী বুইলিচি আমি, শুধা।

– মরিয়মের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে, দুহাত নেড়ে সে প্রতিবাদ জানায়,

– না না, সে তো কিছুই বুলিনি।

– তালি আবার হলু কী! বইসি বইসি কার ধ্যান কচ্ছিস, ইনসান চাচার?

– রক্তের কোনো বন্ধন না থাকলেও মরিয়মের তৃতীয় পক্ষের বৃদ্ধ স্বামী ইনসান আলীকে চাচা বলে ডাকে ছামেনা। সেই চাচাও বেশ গুরুত্ব দেয় ছামেনার কথায়। মরিয়ম সেটা জানে বলেই মাটিকাটার কাজে যাবার জন্যে ছামেনাকে কাজে লাগিয়ে স্বামীর অনুমতি আদায় করে। এমনিতে আলাভোলা সাদাসিধে মানুষ, তবু মরিয়মের আশঙ্কা ছিল– ঘরের বউকে সহজে বাইরে খাটার অনুমতি দেয় কি না। পুরুষ মানুষ একটুখানি গার্জেনগিরি ফলাবে না? পেটের ক্ষুধা কি মানুষকে এতটাই নতজানু করে! প্রস্তাব শুনে তো ইনসান আলীর চোখের কোণা ভিজে আসে। ঠোঁট বিড়বিড় করে সে জানায়– ভাত দিবার ভাতার না, কিল মারার আমি কে?

– তার মানে অনুমতি দিতে মোটেই আপত্তি নেই। বরং তার মতো অক্ষম অথর্ব বৃদ্ধ স্বামীর অনুমতিরও তোয়াক্কা করে কেউ, এটাই তার কাছে অবাক ঘটনা। এখনকার দিনে কে কার তোয়াক্কা করে! আগের দুই পক্ষ মিলিয়ে প্রায় দুই হালি ছেলেমেয়ে তার, এ দুঃসময়ে কে নেয় খোঁজখবর! বাপকে তিন নম্বর বিয়ে করতে দেখে তাদের গায়ে ফোসকা পড়ে যায়, জন্মদাতা বাপকেই বাড়ি থেকে বের করে দেয়; উহ, সে কী অপমান! বার্ধক্যে বিপত্নীক হবার জ্বালা যেন ওদের কাউকে সইতে না হয়! তেমন দুর্ভাগ্য যদি হয়-ই কারো, ইনসান আলী নিশ্চিত– মরিয়মের মতো মেয়ে পাবে না!

– বৃদ্ধ স্বামী ইনসান আলীর এই আস্থা মরিয়মকে খুব দগ্ধায়, মর্মে মর্মে আগুন ধরিয়ে দেয়, এমনকি কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে তোলে। দূরে কোথাও কাজে গেলে সেদিন বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যায়, সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসিয়ে, পঙ্খিরাজের মতো উড়িয়ে নিয়ে আসে ইনুচ, একেবারে উঠোন পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যায়, যাবার সময় কখনো-সখনো রং-রসিকতাও করে, এ সবের কিছুই কি নজরে পড়ে না ইনসান আলীর? দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি ক্ষয়াটে হয়ে এলে অনেকের মনের ভেতরে নানান রকম সংশয় উঁকি দেয়, তখন সামান্য রজ্জুকেও সর্প বলে ভ্রম হয়। কিন্তু মরিয়মের ব্যাপারে ইনসান আলীর কোনো রকম উদ্বেগ বা সংশয় নেই। মাটিকাটা মহলের নারী-পুরুষের ঘরভাঙা-ঘরগড়া নিয়ে কত না মুখরোচক কেচ্ছা হাওয়ায় নাচে, গ্রাম্যকবি ছইরুদ্দি সেসব কেচ্ছা ত্রিপদী পয়ারে বেঁধে

হাটেঘাটে গেয়ে শোনায়। শ্রোতাদের সে কী উচ্ছ্বাস আর উল্লাস! সেই গানই আবার মানুষের মুখে মুখে ডালপালা ছড়ায়, খিস্তিখেউড়ের গন্ধ ছড়ায়। এ সমাজের মানুষ হিসেবে এ সবের কিছুই কি যায় না ইনসান আলীর কানে! সে অচল অক্ষম বলে বাড়ির বাইরে তার যাবার সুযোগ নেই বটে, কিন্তু এ সব মজাদার কেচ্ছা-কাহিনি তো ঘরের ফাঁকফোকর গলে অনায়াসেই ঢুকে পড়ে! অথচ ইনসান আলী এ সবের কিছুই যেন শুনতে পায় না, শুনেও তার বিশেষ কিছুই যায় আসে না। মজার ব্যাপার হচ্ছে বিবাহিতা স্ত্রী হওয়া মরিয়মকে সে কখনোই নাম ধরে ডাকে না, ডাকে ময়নার মা বলে। প্রতিবাদ করেনি মরিয়ম। ময়নাকে পেটে ধরেছে, জন্ম দিয়েছে, বড়ো করে তুলেছে, কাজেই ময়নার মা পরিচয়টি তো মোটেই ছোটো কিছু নয়। ময়নার বাপ তো এক কথায় বউ তালাক দিয়ে ময়নাকেও দুহাতে ঠেলে সরিয়েছে। কদাকার কুৎসিত কেচ্ছা রটাতে একটুও মুখে বাধে না লোকটার। সেয়ানা মেয়ের মুখের দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকায়, ঘাড়মাথা দুদিকে নাড়ায়, তারপর স্পষ্ট জানিয়ে দেয়– সে মোটেই মিল খুঁজে পাচ্ছে না। ময়না তার মেয়ে নয়। ময়নার বুকভাঙা আর্তনাদও তার সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারে না। অন্ধ দৈত্যের মতো এক ধাক্কায় সে সংসারের খুঁটি ভেঙে ফেলে। পেছনে ফিরে তাকায় না।

– ময়নার মা আপন বাপ-ভাইয়ের সংসারে ফিরে এসে মরিয়মের ফেলে যাওয়া আসনটি তন্ন করে খোঁজে। খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়, মেলাতে পারে না। গতর ঢেলে ঘানি টানে সংসারের, তবু মন পায় না ভাই-ভাবিদের। এমনকি বাপের সহানুভূতিও দিনে দিনে কর্পূর হয়ে উবে যায়। অল্পদিনের মধ্য মা-মেয়ে দুয়ে মিলে জগদ্দল পাথর হয়ে ওঠে ভাইদের অভাবী সংসারে। তখন তারা এই বোঝা নামাবার উপায় খোঁজে। কী উপায়! স্বামী-সংসারের সোয়াস্তি মরিয়মের কপালে খুব একটা সয় না, সে প্রমাণ দুদুবারের দৃষ্টান্ত থেকে যথেষ্ট পাওয়া গেছে, তবু পুনর্বার তার বিয়ের আয়োজন করা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে ঘাড়ের বোঝা নামিয়ে ভারমুক্ত হবার পথ আবিষ্কারে তারা তৎপর হয় না। পিতৃবয়সি পাত্র জুটাবার পর ঘাড় বাঁকা করে বসে মরিয়ম নিজে। তার যুক্তি অত্যন্ত সোজা– ঘরসংসারের সাধ খুব মিটেছে তার, ও পথে আর নয়। ভাই-ভাবি বুঝাতে চেষ্টাও করে, পুরুষ মানুষের বয়স কোনো ব্যাপারই নয়, লোকটার ঘরে বউ নেই বলেই বিয়ে করতে চাইছে, এ আর এমন অন্যায় কীসের! মরিয়মের আপত্তি যে মোটেই ওই বয়সের গেরোতে নয় সেটা বুঝাতেই সে দুম করে বলে বসে– আজ বাদে কাল তো ময়নার বিয়ি দিতি হবে, সিডা কারু নজরে পড়ছে না? এ প্রশ্ন শুনে সবাই নতুন করে ময়নার দিকে তাকায়, গ্রামে অমন দশ-বারো বছরে অনেক মেয়েরই বিয়ে হয়, ময়নারও হতে পারে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত মরিয়মের এ আপত্তি ধোপে টেকেনি। গার্জেনরা সোজাসাপ্টা জানিয়েছে, সময় হোক দেখা যাবে। ময়না তো আর ঘাড়ে-মাথায় বেড়ে লম্বা তালগাছ হয়ে যায়নি!

নদীজলে জোয়ার-ভাটা সৃষ্টিতে নিজের প্রভাব সম্পর্কে আকাশের চাঁদ কতটুকু অবহিত সে প্রশ্ন যেমন কাজী নজরুলের গানে উত্থাপিত, ময়নার বেলাতেও সে তথ্য সমানভাবে সত্য। কাজেই ময়না সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য জানিয়ে রাখা যথেষ্ট হবে। নানির মৃত্যুর পরে ময়নাকে খানিকটা বাধ্য হয়েই চলে আসতে হয় মায়ের সংসারে। নতুন জায়গায় নতুন মানুষজনের মধ্যে যে তার খুব ভালো লাগে, তা নয়। সংকোচে ম্রিয়মাণ দিন কাটে তার। সবেমাত্র যৌবনের আলো এসে ঠিকরে পড়েছে সারা শরীরে। সে আর এক বিড়ম্বনা। কারো দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। এমনকি তার মায়ের স্বামী লোকটি কন্যাস্নেহে কাছে ডাকলেও কী যেন অজানা কারণে হাত-পা অসাড় হয়ে আসে, চোখের পাতা তড়পায়। অথচ সেই মানুষটিই দায়িত্ব নিয়ে বছরখানেকের মাথায় তার দূর সম্পর্কের এক মামাতো বোনের ছেলের সঙ্গে ময়নার বিয়ে দিয়ে দেয়। সংসারজীবনে তারা যথেষ্ট ভালো আছে। দেহ-মনে কানায় কানায় পূর্ণ। দুটিতে মানিয়েছেও বেশ। ময়নার মা শুধু আনন্দিত নয়, তৃতীয়পক্ষের এই স্বামীর প্রতি প্রবল কৃতজ্ঞতাও অনুভব করে। বাপ না হয়েও লোকটা বাপের কাজ করেছে, অতি সংগোপনে লুকিয়ে রাখা শেষ সঞ্চয়ের সবটুকু উদার হাতে খরচ করেছে এই বিয়েতে। মা-মেয়ে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারে!

সেই কৃতজ্ঞতার কথা বারংবার মুখের ভাষায় প্রকাশ করেও যেন স্বস্তি হয় না মরিয়মের, কী যে ভীমরতিতে ধরে- একদিন সে শরীরের ভাষার কাছে আশ্রয় খোঁজে। বিয়ের পর বয়সের বাধা ঠেলে তার স্বামী বেশ কয়েক দফা উদ্যত হয়েছে দাম্পত্য নদীতে স্নান করতে। কিন্তু সে কেবল প্রাথমিক উদ্যোগ পর্যন্তই। তারপর সাঁতার-অপটু বালকের মতো হাবুডুবু খেয়ে একাকার। মরিয়ম নিজের শরীরকে বোবা-বধির বানিয়ে রাতের প্রহর পার করেছে। কে জানে আপন মেয়ে-জামাইয়ের বাঁধভাঙা শারীরিক উন্মাদনা অতি নিভৃতে তার ভেতরের নিভন্ত বাতির অচেনা কোনো সলতেয় আগুন ধরিয়ে দেয় কি না। সে রাতে মরিয়ম স্বপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসে স্বামীর কাছে। প্রগাঢ় মমতায় ঘুম ভাঙাতে চায় তার শরীরের। পাথরে পাথর ঘষে আগুন বেরোয় বলে কি সেই পাথর কাদামাটিতে ঘষলেও জ্বলে উঠবে? প্রকৃতপক্ষে সে রাতে মরিয়ম বুকের বারুদ ভিজিয়েছে চোখের জলে।

মরিয়মের জীবনে সর্বনাশের আগুন লাগে আরও কিছুদিন পর।

সেদিন ছিল বৈশাখের প্রথম দিন। বহুদূরে ছিল মাটিকাটার কাজ। বিকেল থেকেই আকাশজোড়া মেঘের দাপাদাপি। কাজের ছুটি হতে তবু দেরি হয়ে যায়। মরিয়ম পড়ি কি মরি করে উঠে বসে ইনুচের সাইকেলের ক্যারিয়ারে। নতুন কিছু নয়, এটাই এখন নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। দলের কেউ কেউ ভ্যানে বা ভটভটানো নসিমনে যায়, কেউ বা জোড় বেঁধে সাইকেলে ওঠে। কদাচিৎ জোড়বদল ঘটলে তা নিয়ে সামান্য হাসি-তামাশাও হয়, রাত পেরোলেই সেই রং আবার ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে যায়।

মেঘের গর্জন ছাপিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয় ঝড়ো হাওয়ার মাতম। ধুলোবালির ঘূর্ণি এসে চোখেমুখে ঝাপটা মারে। অতিদ্রুত ঘনিয়ে আসে অন্ধকার, তারই সঙ্গে ঝুম বৃষ্টি। তৃষ্ণার্ত মাটির বুক উদোম হয়ে যায়। আকাশ থেকে বৃষ্টিকণা নেমে আসতেই উপোস মাটির সে কী সোঁদা ঘ্রাণ! সারা দিন মাটি নিয়েই কেটে যায়, কই, এই ঘ্রাণ তো আগে কখনও পায়নি ইনুচ। ভারি ভালো লাগে মাটির ঘ্রাণ, নেশা ধরে যায় মগজ পর্যন্ত। এদিকে সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসে মরিয়ম ছটফট করে–

বিষ্টিতে ভিজি গেলাম যে, দাঁড়াও কুথাও! দাঁড়াও না!

কোথায় দাঁড়াবে ইনুচ! সামনের এই মাঠ পেরিয়ে তালসারি বাগানের পর গোলাপনগর, ঘন বসতির গ্রাম। অতদূর যেতে যেতে দুজনেই কাকভেজা হয়ে একাকার। অন্ধকারে হ্যান্ডেল ঠিক রেখে সাইকেল চালানো কি সোজা কথা! গোপালনগর প্রাইমারি ইশকুলের কাছে আসতেই সাইকেলের ব্যালান্স হারিয়ে দুজনেই লুটিয়ে পড়ে কাদাপানিতে। সাইকেল ফেলে ইনুচ দুহাতে জাপটে ধরে মরিয়মকে। বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে উঠে আসে ইশকুলের বারান্দায়। চমকে ওঠে ইনুচ– নাসারন্ধ্রের দরজায় আছড়ে পড়ে সোঁদা মাটি থেকে উথলে ওঠা মদির ঘ্রাণ। এতক্ষণের বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে তাদের দেহের ভাঁজে জমে ওঠা ধুলোমাটির আস্তর। তবু সে দিব্যি টের পায় বৃষ্টিপড়া মাটির ভুঁইচাঁপা ঘ্রাণ।

চির নতুন স্বাধীনতা
ইমরুল ইউসুফ

জন্মভূমির সবুজ প্রাণে তিলক আঁকে রক্তজবা
জবা ফুলটি গড়াতে গড়াতে, গড়াতে গড়াতে
হয়ে যায় শহিদের রক্তে গড়া মিনার, স্মৃতিসৌধ
হয়ে যায় দুর্জয় পতাকার রক্তচোখের আগুন
হয়ে যায় গোধূলিলগ্ন সূর্যের নরম আলোকলতা।

জন্মভূমির নরম ঠোঁটে সবুজ প্রজাপতির চুম্বন
প্রজাপতির রং গড়াতে গড়াতে, গড়াতে গড়াতে
হয়ে যায় বঙ্গবন্ধুর শুভ্রদীপ্ত পাজামা-পাঞ্জাবি
হয়ে যায় কালো কোট, মোটা ফ্রেমের চশমা
হয়ে যায় আলো ঝলমলে রুপালি নদীর জল।

জন্মভূমির আকাশ নীলে দোয়েল পাখির পালক
পালকটি বাতাসে গড়াতে গড়াতে, গড়াতে গড়াতে
হয়ে যায় বাংলাদেশের মানচিত্র, জাতির আত্মপরিচয়
হয়ে যায় সংবিধান, সংবেদ, সংসদ আর গণতন্ত্র
হয়ে যায় বাঙালির চির নতুন স্বাধীনতার স্বর্ণস্তম্ভ।

উন্নয়নের তিনটি দৃশ্যমান ছবি
মোহাম্মদ ইল্‌ইয়াছ

পদ্মাবতী পদ্মা, তুমি আমাদের জোয়ার-ভাটায়
ঘর ভেঙেছো, ভাসিয়ে নিয়েছো কূলের ঘাট–
চরের ধান, পালতোলা-নায়ের দাঁড়
বেহুলার ভাসান, আমাদের স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা।

তোমার বিপুল স্রোতের হলো পরাজয়–
তোমাকে আমরা বন্দি করেছি, পরাস্ত করেছি
পারাপারে, ইস্পাতের পুলসিরাত নির্মাণে
আমরা এখন ছয় মিনিটে লক্ষ্যে পৌঁছায়।

এসব পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারীর সাহসী দান।

উড়াল-রেলে তুমি আমাদের কল্পনার অতীত
ধোঁয়াহীন সরণির-ওপরে তোমার চলাচল
কল্পনার জাল ছিঁড়ে আকাশ গাঙে-স্বপ্ন ছড়াই–
যেন রূপকথার রাজ্যের কুমারী কন্যার জয়।

কর্ণফুলির কন্যা তুমি, সাগরে তোমার অভিযাত্রা
তোমার পানিপথ কেটে পাতাল গহ্বরে–
আমরা ধাবিত হবো সেখানেও যোগ্য পিতার
যোগ্য নন্দিনীর শক্ত হাতের অসীম ছোঁয়া।

এসব পিতার আদুরে দুলালীর আরেক সাধ।

বৃষ্টি গোলাপ ওড়ে
কামাল বারি

আজ সারাদিন শ্রাবণী আয়োজন
রিমঝিম বর্ষণ
বৃষ্টি ধারায় আলো-আঁধারের খেলা
জাদু সুরে অদ্ভুত আবাহনী!

আজ মেঘেরা দলে দলে ওড়ে
ঝরে পড়ে
ওর কেশের সাথে জল খেলে
কী দারুণ রঙে
নেমে আসে ঘাসে!

আজ অগণন বৃষ্টি গোলাপ ওড়ে
নেমে আসে
সখী রঙে উৎসবে
আহা, ওর চুল চুমে চুমে!

আমার প্রিয়ার একাকী বিষণ্ন সন্ধ্যা আজ
বৃষ্টির সুর বেদনাবিধুর বিরহে ভরা;

আজ সারারাত আকাশে মেঘে
আলোয় জেগেছে গভীরতর ছায়া...।

এইতো বর্ষাকাল
সপ্তিকা চক্রবর্তী

আষাঢ়েতে বাদল ধারা ঝরঝরিয়ে আসে,
টলমলে জল হেসে বেড়ায় মাঠের সবুজ ঘাসে।
বৃষ্টি ধারায় মাথা নেড়ে গাছের স্নানটি সারা,
খুশিতে সব ছেলেমেয়ের মন যে পাগল পারা।
বৃষ্টি ছন্দে ফুলগুলো সব খেলছে আপন মনে,
পাখিগুলো ডানা মেলে উড়ছে গগন কোণে।
আসছে আবার শ্রাবণ ফিরে আষাঢ় হলেই পার,
গভীর রাতে আকাশ মাঝে মেঘগুলো হয় ভার।
থেমে গেলে বৃষ্টি হঠাৎ,একটু রোদের হাসি,
নিমিষেই আঁধার ভুবন মেঘ যে রাশি রাশি।
প্রবল রোদের তাপের মাঝে, একটু হিমেল হাওয়া,
হরেক রূপেই ষড়ঋতুর চলছে আসা-যাওয়া।
খেলছে ভরা পুকুর জলে পাতিহাঁসের পাল,
হাসছে ভুবন বৃষ্টি ধারায় এইতো বর্ষাকাল।

বর্ষা এলো
শাহীন খান

বর্ষা এলো ফরসা আকাশ লেপটে গেল মেঘে
বাতাস ছোটে তড়িঘড়ি দুরন্তময় বেগে।
ঠান্ডা হলো ভূপ্রকৃতি ঠান্ডা হলো শরীর
চোখের নীলে স্বপ্ন যত করল সবে ভিড়।

হাঁসের খেলা সারাবেলা ডুবসাঁতারের ঢেউ
ফুটছে বনে কদম-কেয়া দেখছোনি তা কেউ?
ডাহুক পাখির আনাগোনা পানকৌড়িতে ডাক
মাঝি ছোটে তেপান্তরে পল্লিগাঁয়ের বাঁক।

দুষ্টুছেলে ভেলা করে ঝিলের মাঝে যায়
কেউ বা আবার নুডলস রেঁধে মজা করে খায়।
জানালা দিয়ে খোকা তাকায় মাঠে এলো জল
সেই জলেতে পাড়ার কিশোর করছে কোলাহল!

শীতল হাওয়ায় ঘুম এসে যায় কেউবা পাড়েন ঘুম
কবির মনে ছন্দগাঁথা নাচতেছে রুমঝুম।
মোবাইল ফোনে কার্টুন দেখে খুকি বেসামাল
ব্যাঙরা ডাকে উদাস হয়ে খানিক মারে ফাল।
কেউবা আবার গল্পে মাতেন দিদা চিবান পান
ও গাঁও থেকে ভেসে আসে 'পাগলা সোনা'র গান!
কাদাজলে হয় একাকার শুকনো চলার পথ
এক নিমেষে আলুথালু কারো ভবিষ্যৎ!

গাছপালা সব জেগে ওঠে সবুজ সমাহার
এমন দিনে গরিব লোকের চলে না সংসার!

বৃক্ষবন্ধু
এম.আবু বকর সিদ্দিক

বৃক্ষ বন্ধু ডাকে তোমায়
নেড়ে সবুজ পাতা,
তপ্ত রোদে ক্লান্ত হলে
মাথায় ধরে ছাতা।

আপদকালে যখন তোমার
পকেটটা হয় ফাঁকা,
আত্মবলি দিয়ে বন্ধু
আনে নগদ টাকা।

কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিয়ে
বায়ু করে শুদ্ধ,
অক্সিজেন না দিলে বন্ধু
জীবনটা হয় রুদ্ধ।

গাছগাছালি জীবনসঙ্গী
থাকুক চতুর্পাশে,
বৃক্ষরোপণ করো সবাই
আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে।

প্রিয় দেশে
রবিউল ইসলাম

প্রায় ত্রিশ লক্ষ প্রাণ
কত সংগ্রাম ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে
তোমাকে পেয়েছি; বাংলাদেশ

তোমাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন
তোমাকে নিয়ে অনেক সম্ভাবনার হাতছানি

স্বাধীন দেশে
নিজের মতো করে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা
সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়
বৈষম্যহীন সমতার সমাজ গঠনের পথচলা

বাঙালির আত্মপরিচয়ে হবো গর্বিত
জ্ঞান-বিজ্ঞান মুক্তচিন্তার আলোয়,
হবো আলোকিত।

প্রকৃতি ও আমি
মিতা চক্রবর্তী

আজ প্রভাতের পুণ্যস্নানে মত্ত পৃথিবী
সবুজে-সবুজে ঢলাঢলি
হাসিতে হাসিতে লুটোপুটি–
যেন অবগাহন করছে প্রেমের সমুদ্রে!
চিত্তে প্রশান্তি-হৃদয়ে শীতলতা
শান্ত-সুনিবিড়-গভীর স্নিগ্ধতা!
তোমার আগমনে আমি যেমন
পুণ্যস্নান করি–
লুটোপুটি খাই হাসিতে
অবগাহন করি প্রেমের সমুদ্রে
হৃদয়ে বিরাজ করে গভীর স্নিগ্ধতা।

আমি আর প্রকৃতি
মিলেমিশে একাকার!
আমার মহাপুরুষ তুমি
আর প্রকৃতির বন্ধু মধুর বরষা।
ক্ষণে ক্ষণে আসে বরষা
সিক্ত প্রকৃতি।

আমার মাঝে যেমন তোমার
উদ্দাম মতিগতি!
আমায় করেছ ধন্য
তুমি আমায় করেছ অনন্যা।
প্রকৃতি-আমি-তুমি-বরষা
মাঝে নেই কোনো সীমানা।

কুরবানি আমাদের মাঝে সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেয়

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে দেশবাসীসহ বিশ্বের সকল মুসলমানদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানিয়ে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, কুরবানি আমাদের মাঝে সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেয়। ২৯শে জুন পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে ২৮শে জুন দেওয়া এক বাণীতে তিনি বলেন, কুরবানি আমাদের মাঝে আত্মদান ও আত্মত্যাগের মানসিকতা সঞ্চারিত করে, আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশীর সঙ্গে সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেওয়ার মনোভাব জাগ্রত করে এবং সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেয়।

রাষ্ট্রপতি বলেন, মহান আল্লাহর প্রতি গভীর আনুগত্য ও সর্বোচ্চ ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর পবিত্র ঈদুল আজহা। 'আজহা' অর্থ কুরবানি বা উৎসর্গ করা। ঈদুল আজহা উৎসবের সাথে মিশে আছে চরম ত্যাগের শিক্ষা ও প্রভু প্রেমের পরাকাষ্ঠা। মহান আল্লাহর নির্দেশে স্বীয় পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.)-কে কুরবানি করতে উদ্যত হয়ে হযরত ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহর প্রতি অগাধ ভালোবাসা, অবিচল আনুগত্য ও অসীম আত্মত্যাগের যে সুমহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা ইতিহাসে অতুলনীয়। তিনি বলেন, করোনা মহামারির অভিঘাত ও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ-সংঘাতের কারণে বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি ঊর্ধ্বমুখী। এ প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাপী নিম্ন আয়ের মানুষ নানা প্রতিবন্ধকতার মাঝে দিনাতিপাত করছে।

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন সমাজের দারিদ্র্যপীড়িত ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করতে এবং তাদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমি দেশের বিত্তবান ও সচ্ছল ব্যক্তিবর্গকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। ত্যাগের শিক্ষা আমাদের ব্যক্তি জীবনে প্রতিফলিত হোক এটাই সকলের কাম্য।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, মহান আল্লাহর নিকট কুরবানি কবুল হওয়ার জন্য শুদ্ধ নিয়ত ও বৈধ উপার্জন আবশ্যক। সরকার নির্ধারিত স্থানে কুরবানি করে এবং কুরবানির বর্জ্য অপসারণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ বন্ধে সকলে সচেষ্ট থাকবেন বলে আমি আশা রাখি। পবিত্র ঈদুল আজহা সবার জন্য বয়ে আনুক কল্যাণ, সবার মধ্যে জেগে উঠুক ত্যাগের আদর্শ। ঈদের আনন্দ ছড়িয়ে পড়ুক সবার মাঝে।

সংখ্যা নয়, গবেষণায় গুণগত মানও নিশ্চিত করুন

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু সংখ্যা নয়, গবেষণার গুণগত মান নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতির সাথে

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের সাথে ১৫ই জুন ২০২৩ বঙ্গভবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন– পিআইডি

১৫ই জুন বঙ্গভবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এ নির্দেশনা দেন। তিনি বলেন, গবেষণা শুধু সংখ্যায় বাড়লেই চলবে না, গুণগত মান যাতে নিশ্চিত হয়– সে ব্যাপারেও পদক্ষেপ নিতে হবে।

রাষ্ট্রপতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নতুন জ্ঞানের অন্বেষণ এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের সাথে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যেতে গবেষণা কাজে অধিক মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সেশনজট মুক্ত করায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, সরকারের ধারাবাহিকতা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এ বিষয়ে ইতিবাচক অবদান রেখেছে। বিশ্ববিদ্যালয় আচার্য বলেন, দেশ এখন উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হলে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে নতুন নতুন উদ্ভাবনের বিকল্প নেই।

উপাচার্য আখতারুজ্জামান এ সময় রাষ্ট্রপতিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক উন্নয়ন ও শিক্ষা কার্যক্রমসহ সার্বিক কার্যক্রম অবহিত করেন। ড. আখতারুজ্জামান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন সেশনজট মুক্ত। লস অ্যান্ড রিকভারি প্ল্যানের আওতায় পরীক্ষা ও ক্লাসসূচি পুনর্নির্ধারণের মাধ্যর্মে করোনার ফলে সৃষ্ট সেশনজট ইতোমধ্যেই মুক্ত করা হয়েছে। এর পরে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন। রাষ্ট্রপতি শিক্ষা কার্যক্রমে যেন গুণগত মান নিশ্চিত হয় এবং কারিকুলাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি বিবেচনায় নেওয়া হয়, সে ব্যাপারে নির্দেশ দেন।

সুফিয়া কামাল বাংলাদেশের নারীসমাজের এক অনুকরণীয় উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, কবি সুফিয়া কামাল বাংলাদেশের নারীসমাজের এক অনুকরণীয় উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তিনি নারীসমাজকে কুসংস্কার আর অবরোধের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করতে আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। রাষ্ট্রপতি কবি বেগম সুফিয়া কামালের ১১২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯শে জুন দেওয়া এক বাণীতে এসব কথা বলেন। সুফিয়া কামালের জন্ম ১৯১১ সালের ২০শে জুন। তৎকালীন বাঙালি মুসলমান নারীদের লেখাপড়ার সুযোগ সীমিত থাকলেও সুফিয়া কামাল নিজ চেষ্টায় লেখাপড়া করেন এবং ছোটোবেলা থেকেই কবিতা চর্চা শুরু করেন। নারী জাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ এই কবির জন্মবার্ষিকীতে তিনি তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান।

রাষ্ট্রপতি বলেন, সুললিত ভাষা ও ব্যঞ্জনাময় ছন্দে তাঁর কবিতায় ফুটে উঠত সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের পাশাপাশি সমাজের সার্বিক চিত্র। নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া ছিলেন তাঁর অনুপ্রেরণার উৎস। ১৯২৬ সালে কবির প্রথম কবিতা 'বাসন্তী' প্রকাশিত হয় *সওগাত* পত্রিকায়। ১৯৩৮ সালে প্রথম কাব্যগ্রন্থ *সাঁঝের মায়া* প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ এ কাব্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা লিখেন কাজী নজরুল ইসলাম। সুফিয়া কামাল সুদীর্ঘকাল ধরে সাহিত্যচর্চা, সমাজসেবা ও নারী কল্যাণমূলক কাজে নিজেকে নিবেদিত রেখেছিলেন।

কবি সুফিয়া কামাল বাংলাদেশের নারীসমাজের এক অনুকরণীয় উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সুফিয়া কামাল নারীসমাজকে কুসংস্কার আর অবরোধের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করতে আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। দেশের সকল প্রগতিশীল আন্দোলন-সংগ্রামে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। নারীদের সংগঠিত করে মানবতা, অসাম্প্রদায়িকতা, দেশাত্মবোধ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ একটি মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল সুফিয়া কামালের জীবনব্যাপী সংগ্রামের প্রধান লক্ষ্য।

তিনি বলেন, কবি সুফিয়া কামাল রচিত সাহিত্যকর্ম নতুন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গভীর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করবে। রাষ্ট্রপতি মহীয়সী এ নারীর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ছড়িয়ে দিন

মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বিজয়গাথা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ছড়িয়ে দিতে সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম-মুক্তিযুদ্ধ '৭১- কে তাগিদ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। ফোরামের নির্বাহী সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. নুরুল আলম এবং মহাসচিব লেখক ও সাংবাদিক বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুন হাবিব ১৩ই জুন রাষ্ট্রপতির সাথে বঙ্গভবনে দেখা করতে গেলে তিনি এ নির্দেশনা দেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বিজয়গাথা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ছড়িয়ে দিন। রাষ্ট্রপ্রধান ১৯৭১-এর গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের ব্যাপারে সেক্টর কমান্ডারস ফোরামকে তৃণমূল পর্যায় থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সর্বস্তরে জনমত সৃষ্টিতে কাজ করার আহ্বান জানান। রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব বাসসকে জানান, সাক্ষাৎকালে নেতৃবৃন্দ ফোরামের সার্বিক কার্যক্রম ও কর্মপরিকল্পনা রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন। তারা রাষ্ট্রপতিকে জানান, ১৯৭১ সালে সংঘটিত গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করছে। রাষ্ট্রপতি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের বিজয় বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়।

উন্নয়ন প্রকল্প নির্বাচনে জনস্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিন

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন দেশের উন্নয়ন প্রকল্প নির্বাচনে জনস্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি ১৫ই জুন বঙ্গভবনে পাবনা জেলার উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প উপস্থাপনা প্রত্যক্ষ করার সময় এ নির্দেশনা দেন। পাবনার সড়ক যোগাযোগ, পানি উন্নয়ন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ ভৌত কাঠামো উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ তাদের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প প্রস্তাবনা তুলে ধরেন। সকল প্রকল্প একইসঙ্গে বাস্তবায়ন সম্ভব নয় উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন স্থানীয় প্রয়োজনীয়তা ও জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্বল্পমেয়াদি প্রকল্পগুলো এখনই বাস্তবায়ন করার নির্দেশ দেন। রাষ্ট্রপ্রধান অন্যান্য মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কাজের গুণগত মান ও নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজ শেষ করারও তাগিদ দেন তিনি। পাবনা সদরের সংসদ সদস্য গোলাম ফারুক খন্দকার প্রিন্স এসময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন: মিতা খান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ই জুলাই ২০২৩ তাঁর কার্যালয়ের শাপলা হলে 'প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ অ্যাওয়ার্ড ২০২৩-২০২৪' প্রদান করেন– পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশের উন্নয়ন জোরদারে নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করুন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আমরা কখনই অন্যের মডেলের ওপর নির্ভর করব না। দেশের সার্বিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে আমরা নিজস্ব মেধা ও চিন্তার প্রয়োগ ঘটাবো। ৯ই জুলাই বিশ্বব্যাপী শীর্ষ র‍্যাংকিংয়ে থাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জনের জন্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে (পিএমও) আয়োজিত ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে ১০ জনকে পিএইচডি ফেলোশিপ ও ৩৮ জনকে মাস্টার্স ফেলোশিপ হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রথমত আমাদের দেশকে জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং অনুভব করতে হবে যেখান থেকে আপনি জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। দেশের উন্নয়নের পরিকল্পনা তৈরি করতে আপনাকে বিদেশে উচ্চশিক্ষার জ্ঞানের সাথে দেশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার জ্ঞানকে সমন্বয় করতে হবে, যা টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ প্রতিটি খাতে উন্নয়নের জন্যে সরকারের পদক্ষেপের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সঠিক পরিকল্পনা যে দেশকে সার্বিক উন্নয়নের দিকে নিয়ে যেতে পারে তা গত সাড়ে ১৪ বছরে তারা প্রমাণ করেছেন।

উল্লেখ্য, বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্যে এ পর্যন্ত ২৭৭ জনকে মাস্টার্স এবং ১০৮ জনকে পিএইচডি ফেলোশিপ দেওয়া হয়েছে। এই বৃত্তি পেতে হলে প্রত্যেক আবেদনকারীকে আগে নিজ যোগ্যতায় বিশ্বের ১০০ র‍্যাংকিংয়ের মধ্যে থাকা যে-কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করতে হয়। ভর্তি নিশ্চিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ)-এর আওতায় এই বৃত্তির জন্যে আবেদন করতে হয়।

গণতন্ত্র ও স্থিতিশীলতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের চলমান উন্নয়ন ও অগ্রগতি ধরে রাখতে গণতন্ত্র ও স্থিতিশীলতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন, যাতে দেশের গণতন্ত্র ও স্থিতিশীলতা অব্যাহত থাকে। দেশে দীর্ঘসময় গণতন্ত্র থাকায় আমরা দেশকে একটি উন্নয়ন ও উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছি। গণতন্ত্র ও স্থিতিশীলতা অব্যাহত না থাকলে এ অর্জন সম্ভব হতো না। ৬ই জুলাই জাতীয়

সংসদ ভবনের উত্তর প্লাজায় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের নতুন অফিস উদ্বোধনের সময় তিনি এসব কথা বলেন। গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত থাকা যে দীর্ঘ সংগ্রামের ফল, তা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে এসময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটা একদিনে আসেনি। শুধু সংসদ নয়, সমগ্র বাংলাদেশে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। সরকার ২০০৯ সাল থেকে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বজায় রেখেছে।

সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যরা সবসময় দেশে ও বিদেশে মানুষের পাশে দাঁড়ায়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যরা তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সবসময় দেশে ও বিদেশে মানুষের পাশে দাঁড়ায়। ৫ই জুলাই ঢাকা সেনানিবাসের সদর দফতরে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের (পিজিআর) ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি একথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাহিনীর সদস্যরা পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার সাথে তাদের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি শুধু দেশেই জনগণের পাশে দাঁড়ায় না, অধিকন্তু বিদেশে শান্তিরক্ষা মিশনেও কাজ করে। তাদের মানবিক সদিচ্ছার কারণে তারা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সম্মান পায়। আমি খুব গর্ববোধ করি, যখন রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানরা তাদের দেশে অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের প্রশংসা করেন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, তাঁর সরকার ঝুঁকিপূর্ণ রক্ষীদের ঝুঁকি বিবেচনা করে প্রথমে পিজিআর-এর জন্য ঝুঁকি ভাতা চালু করে। ইতোমধ্যে সরকার গণভবন সংলগ্ন ব্যারাক তৈরি এবং গার্ডদের পরিবারের জন্য ১৪তলা ভবন নির্মাণের মাধ্যমে আবাসন সমস্যার সমাধান করেছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে জনপ্রতিনিধিদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত করার জন্য আমি (দল-মত নির্বিশেষে) সকল জনপ্রতিনিধিকে আহ্বান জানাচ্ছি। বাংলাদেশের জনসংখ্যা, অর্থনীতি ও কৃষিসহ সবকিছুই স্মার্ট হবে। তাই দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নে কাজ করতে হবে। ৩রা জুলাই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের শাপলা হলে তিন সিটি করপোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র– বরিশালের আবুল খায়ের আবদুল্লাহ, খুলনার তালুকদার আবদুল খালেক ও গাজীপুরের জায়েদা খাতুনের শপথ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় প্রধানমন্ত্রী নবনির্বাচিত মেয়র ও কাউন্সিলরদের উদ্দেশে বলেন, আপনারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে তাদের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। আমি চাই, আপনারা জনগণের সেবা ও তাদের প্রত্যাশা পূরণ করবেন।

সারা বিশ্বের সকল শিশুর টিকাদান নিশ্চিত করার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বিশ্বব্যাপী সব শিশু যাতে মারাত্মক সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের টিকা পায়, তা নিশ্চিত করতে আমাদের অবশ্যই একসাথে কাজ করতে হবে। স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে ১৩ থেকে ১৫ই জুন অনুষ্ঠিত জিএভিআইর 'গ্লোবাল ভ্যাকসিন ইমপ্যাক্ট কনফারেন্স: রেইজিং জেনারেশন ইমিউনিটি'-তে প্রধানমন্ত্রী একটি ভিডিও বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। 'জেনারেশন ইমিউনিটি' বাড়ানোর লক্ষ্যে এই সম্মেলনের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভ্যাকসিন তৈরি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে জিএভিআইর এই সহায়তাকে চমৎকারভাবে ব্যবহার করে বাংলাদেশ প্রাথমিক টিকাদানের কভারেজ ৯৮ শতাংশ পর্যন্ত সম্প্রসারণ করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ প্রতিবছর একটি জাতীয় টিকা দিবস পালন করে। আমাদের সরকার ন্যায় ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে জাতীয় টিকা নীতি প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ ও জিএভিআইর মধ্যে ২০০১ সালে শুরু হওয়া অংশীদারিত্বের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, জিএভিআইর সহায়তায় বাংলাদেশ এখন জরায়ুর ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এইচপিভি ভ্যাকসিন চালু করেছে। এছাড়া আমরা কলেরা ভ্যাকসিন নিয়ে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছি এবং আমাদের অভিজ্ঞতা অন্যান্য দেশে পৌঁছে দিয়েছি। বাংলাদেশ ২০০৯ ও ২০১২ সালে জিএভিআই অ্যালায়েন্স অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে বলে তিনি গর্বিত বলেও জানান।

বাংলাদেশ এখন বিশ্বে অর্থনৈতিকভাবে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ২০০৯ সাল থেকে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকায় বাংলাদেশ এখন বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিকভাবে একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। ১৫ই জুন সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ) আয়োজিত 'নিউ ইকোনমি অ্যান্ড সোসাইটি ইন স্মার্ট বাংলাদেশ' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা লেখক মো. নজরুল ইসলাম জানান, প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০০৯-২০২৩ মেয়াদে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, মাথাপিছু আয় ২৮২৪ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে, যা ২০০৬ সালে ছিল মাত্র ৫৪৩ মার্কিন ডলার। দারিদ্র্যের হার প্রায় ৪১.৫ শতাংশ থেকে প্রায় ১৮.৭ শতাংশে নেমে এসেছে এবং চরম দারিদ্র্যের হার ২৫.৫ শতাংশে থেকে ৫.৬ শতাংশে নেমে এসেছে।

প্রধানমন্ত্রীর ৫০ লাখ গৃহহীন ও ভূমিহীন মানুষকে বাড়ি বিতরণের কথা উল্লেখ করে বলেন, দেশে একজন মানুষও গৃহহীন ও ভূমিহীন থাকবে না। একটি জাতির ভবিষ্যৎ গড়তে ভিশন থাকার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, ২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ ২০২১ সালের রূপকল্প ঘোষণা করেছিল এবং সেই রূপকল্প–২০২১ বাস্তবায়ন হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ ও স্মার্ট জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে তাঁর সরকার রূপকল্প–২০৪১ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

উন্নত দেশে পরিণত হতে হলে স্থলবন্দরসমূহকে দক্ষ ও স্মার্ট হতে হবে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের উন্নত দেশে পরিণত হতে হলে বাণিজ্য সম্প্রসারণ, সীমান্ত বাণিজ্য ও যোগাযোগ সহজীকরণে স্থলবন্দরসমূহকে দক্ষ ও স্মার্ট হতে হবে। বর্তমান সরকার অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা–২০৩০ এবং ডেল্টা প্ল্যান–২১০০ গ্রহণ করেছে। এসব পরিকল্পনা, রূপকল্প ও অভিলক্ষ্যের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি, খাদ্য ও বাসস্থানের সংস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। ১৪ই জুন বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ২২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে এসব কথা বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ট্রান্সপোর্ট ও ট্রান্সশিপমেন্ট কেন্দ্র হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দেশ। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে স্থলবন্দরসমূহ দেশের ব্যাবসাবাণিজ্যের উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বিশেষ করে ভারত, নেপাল, ভুটান এবং মিয়ানমারের সাথে স্থলসীমান্ত পথে কম খরচে ও সহজে যোগাযোগের সুযোগ ব্যবহার করে যাত্রী চলাচল ও মালামাল পরিবহণের মাধ্যমে স্থল বাণিজ্য বিকশিত হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণ আমাদের সরকারের অগ্রাধিকারমূলক উন্নয়ন কৌশল। এরই ধারাবাহিকতায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এবং জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে সেবা সহজীকরণ ও ই-সার্ভিসের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যার ফলে স্থলবন্দরসমূহে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আন্তঃদেশীয় পণ্য চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থা সহজ হয়েছে। এসব উন্নয়ন কার্যক্রমের সুফল হিসেবে কোভিড-১৯-এর মতো ভয়াবহ অতিমারির মধ্যেও বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ সার্বক্ষণিক বন্দরের কার্যক্রম চালু রাখার মাধ্যমে হাসপাতালগুলোতে জরুরি অক্সিজেন সরবরাহ কাজে অসামান্য অবদান রেখেছে এবং যাত্রীদের সীমান্ত পারাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেছে।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়: বিশেষ প্রতিবেদন

স্বাধীনতা দেশের সবচেয়ে বড়ো অর্জন

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, আওয়ামী লীগ ৭৪ বছরের পথ চলায় বাঙালি জাতির সকল অর্জনের সাথে জড়িয়ে আছে, যার সবচেয়ে বড়ো অর্জন বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। তিনি বলেন, বাংলাদেশ আজকে আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বল্পোন্নত থেকে মধ্যম আয়ে, খাদ্যে ঘাটতি থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণতায় উন্নীত হয়েছে, বিশ্বে একটি মর্যাদাশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই কারণে বাঙালির ইতিহাস লিখতে গেলে আওয়ামী লীগের নাম লিখতে হবে। ২৩শে জুন ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে দলীয়ভাবে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে মিন্টো রোডের সরকারি বাসভবনে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে হাসান মাহ্‌মুদ এসব কথা বলেন।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রাম উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৬৬ সালে ছয় দফা দাবির মধ্য দিয়ে স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন সূচনা করেন। সেই পথ ধরে ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর মূল লক্ষ্য স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জন করেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে গঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের অধীনেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল, মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরগুলো গঠিত হয়েছিল, সেক্টর কমান্ডারদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল, ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা যেন সেই হারানো স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার জন্যই, যাঁদের নেতৃত্বে আমরা ১৯৭১ সালে স্বাধীন হয়েছি। সে কারণে এই দিনটি বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এ দিন সাংবাদিকদের কাছে আওয়ামী লীগের সূচনালগ্ন বর্ণনা করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ১৯৪৯ সালের এই দিনে ঢাকার রোজ গার্ডেনে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি এবং শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিল। তৎকালীন তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এক নম্বর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। পরবর্তীতে অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে আরও শানিত করার লক্ষ্যে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে দলের নাম আওয়ামী লীগ হয়। ১৯৫০ সালে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়, যার সভাপতি ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন।

স্বাধীনতা-পূর্বকালেও আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতির জন্য অনেক অর্জন বয়ে এনেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগ সভাপতি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকেই মূলত ২১শে ফেব্রুয়ারি মহান ভাষা শহিদ দিবস রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন শুরু হয়। কারণ ১৯৫২ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি পাকিস্তান সরকার মেনে নিলেও রাষ্ট্রীয়ভাবে তা প্রতিষ্ঠা করেনি, সেটি করেছিল আওয়ামী লীগ সরকার।

জীবনযুদ্ধে জয়ের হাতিয়ার অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর নিরন্তর সংগ্রাম

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, জীবন এক যুদ্ধক্ষেত্র। ইচ্ছাশক্তির কমতিই এখানে সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধকতা। তাই অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর নিরন্তর সংগ্রামই জীবনযুদ্ধে জয়ের সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার। ২২শে জুন রাজধানীর মিরপুরে স্কলাস্টিকা প্রধান শাখার 'এ লেভেল' শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন তিনি।

দেশ-বিদেশের বিদ্যাপীঠ থেকে তার অর্জিত শিক্ষা ও জীবনসংগ্রাম থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতার ওপর আলোকপাত করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, প্রতিবন্ধকতা দেখে হতোদ্যম না হয়ে লড়াই অব্যাহত রাখতে হবে। কোনো পরীক্ষার ফল খারাপ হলে মন খারাপ নয়, সেখান থেকেই নতুন উদ্যমে চেষ্টা করতে হবে। দৃপ্ততার সাথে শপথ নিতে হবে– আমাকে বিশ্বজয়ী হতে হবে, আমাকে এটা করতে হবে, পারতে হবে, আমি সফল হবোই। তাহলেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে। জীবনের কোনো কোনো পর্যায়ে আমাদেরকে একাই লড়াই করতে হয় উল্লেখ করে তিনি এ সময় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, লতা মুঙ্গেশকর, বিল গেটস প্রমুখ বিশ্বের সফলতম

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ২২শে জুন ২০২৩ ঢাকায় মিরপুরে স্কলাস্টিকা স্কুলে এ-লেভেল শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

ব্যক্তিদের জীবনের হার না মানা সংগ্রামের উদাহরণ তুলে ধরেন। শিক্ষার্থীদেরকে তাদের আজকের অবস্থানে উত্তরণের পেছনে মা-বাবা, পরিবার ও শিক্ষকদের যে পরম অবদান রয়েছে তা সারাজীবন স্মরণ রেখে সম্মান দিতে হবে বলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ।

এখন লক্ষ্য বিশ্বাঙ্গন

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, করোনার মন্দা কেটে বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের সিনেমা শিল্প আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আমাদের লক্ষ্য বিশ্ব অঙ্গনে জায়গা করে নেওয়া এবং সেটি সম্ভব। ২১শে জুন রাজধানীর তেজগাঁওয়ে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন-বিএফডিসিতে প্রয়াত চিত্রনায়ক ও সংসদ সদস্য আকবর হোসেন পাঠান ফারুকের স্মরণে সম্মিলিত চলচ্চিত্র পরিষদ আয়োজিত ‘হৃদয়ে জাগ্রত তুমি’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। এসময় প্রয়াত চিত্রনায়ক ফারুকের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে চলচ্চিত্র ও রাজনীতিতে তার কর্মময় জীবন স্মরণ করেন তিনি ।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, করোনায় আমাদের আড়াই বছর মন্দা গেছে। এখন মহামারি কেটে গেছে, সিনেমা শিল্প ঘুরে দাঁড়িয়েছে। প্রদর্শক সমিতি বলছেন, এখন অনেক সিনেমা হচ্ছে। সিনেপ্লেক্স-সিনেমা হল নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের জন্য স্বল্পতম সুদে এক হাজার কোটি টাকার ঋণ তহবিল হয়েছে। এক হাজার আসনের মিলনায়তন, চারটি শ্যুটিং ফ্লোর, দুটি সিনেপ্লেক্স, দুটি সুইমিংপুলসহ বিএফডিসিতে নতুন কমপ্লেক্স নির্মাণ হচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে সিনেমার অনুদানও বাড়ানো হয়েছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, এ বছর ২৩টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবিতে অনুদান দেওয়া হয়েছে। আগে ১০টাতে দেওয়া হতো। তবে সিনেমা শিল্প কখনো অনুদাননির্ভর হতে পারে না, সে কথাও তিনি স্মরণ করিয়ে দেন। দেশের চলচ্চিত্র অঙ্গনকে মেধাসমৃদ্ধ বর্ণনা করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, আমাদের পরিচালক, অভিনয় শিল্পী, কলাকুশলীরা যেভাবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পুরস্কার পাচ্ছে, তা তাদের মেধার পরিচয়। এই মেধা কাজে লাগালে আমাদের সিনেমা শিল্প বিশ্ব অঙ্গনেও জায়গা করে নেবে। সবাই মিলে সেই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

ভালো ঘটনা ও সাফল্যের সংবাদ এড়িয়ে যাওয়া বুদ্ধিবৃত্তিক অন্যায়

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, রাষ্ট্র ও সমাজের ভালো ঘটনা ও সাফল্যের সংবাদ এড়িয়ে যাওয়া বুদ্ধিবৃত্তিক অন্যায়। ১৯শে জুন রাজধানীতে জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা আয়োজিত ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দশ উদ্যোগ: বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রার মাইলফলক’ গোলটেবিল আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ কথা বলেন। সমালোচনা অবশ্যই থাকবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সমালোচনাহীন ‘মনোটোনাস সোসাইটি’ বা একঘেঁয়ে সমাজ নয়, আমরা একটি বহুমাত্রিক সোসাইটিতে বসবাস করি। সে জন্য সমালোচনা থাকতে হবে কিন্তু সমালোচনার পাশাপাশি দেশটা যে বদলে গেল, প্রতিটি মানুষের ভাগ্যের চাকা যে বদলে গেল– সে কথাটাও তো বলতে হবে। সেটি না হলে তো মানুষের সামনে ঠিক চিত্র পরিস্ফুটন করা হয় না এবং আমার বিবেচনায় সেটি এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক অপরাধ। আমরা যেন সেই অপরাধ না করি।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, আমি সাংবাদিকদের অনুরোধ জানাবো, সমালোচনার পাশাপাশি সাফল্যটাও যেন উঠে আসে, আজকে দেশ যে বদলে গেছে সেই সত্য বিষয়টি যেন মানুষের সামনে আমরা তুলে ধরতে পারি। তিনি বলেন, পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত যার নিত্যসঙ্গী, মাথাপিছু কৃষিজমি সর্বনিম্ন, আয়তনের দিক দিয়ে পৃথিবীর ৯২তম হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ ধান ও মিঠাপানির মাছ উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয়, সবজি উৎপাদনে চতুর্থ, আলু উৎপাদনে সপ্তম এবং খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কোনো জাদুর কারণে নয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাদুকরী নেতৃত্বের কারণেই এসব অনন্য অর্জন সম্ভবপর হয়েছে। শতবর্ষী বদ্বীপ পরিকল্পনা–২১০০ প্রণয়ন, দেশব্যাপী ১০০ শিল্পাঞ্চল গড়ার পরিকল্পনা, স্বাধীনতার সময়ে দেশের জিডিপিতে শিল্প খাতের ৬ শতাংশ অবদানকে ৩৫ শতাংশে উন্নীত করা, সারা দেশে শতভাগ বিদ্যুৎ, গ্রামে গ্রামে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ও ডিশ এন্টেনার সংযোগ, এই বদলে যাওয়া বাংলাদেশের কথা সাংবাদিকরা তুলে ধরবেন–এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী।

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু: জুলিও কুরি ও এশীয় শান্তি সম্মেলন গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

সচিবালয়ে ১১ই জুন প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআইবি) প্রকাশিত *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : জুলিও কুরি ও এশীয় শান্তি সম্মেলন* গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. ফারুক আহমেদ, পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ, সহযোগী সম্পাদক এ কে এম শামসুদ্দিন, গ্রন্থকার ও গবেষক পপি দেবী থাপা প্রমুখ এসময় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী পিআইবিকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, পিআইবি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয় সে সময়ের বিশ্ব প্রেক্ষাপটে শুধু একটি জাতির জন্ম নয়, একটি জাতির জন্মের বিস্ফোরণ ছিল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ যেমন স্বাধীনতা অর্জন করেছিল পাশাপাশি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সেই কারণেই তাঁকে ১৯৭৩ সালে জুলিও কুরি শান্তি পদকে ভূষিত করা হয়েছিল। সেই সময়কার প্রেক্ষাপট, সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদসহ সেই বিষয়গুলোকে একটি পুস্তকের মধ্যে আবদ্ধ করে ইতিহাসকে সংরক্ষণ এবং সেই প্রেক্ষাপটে জাতির পিতার ভূমিকা জানার ক্ষেত্রে এই বইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেন তিনি।

এখনই সময় চারা রোপণের

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, এখন জুন-জুলাই মাস গাছ লাগানোর উপযোগী সময়, প্রত্যেকে তিনটি করে গাছ লাগাবেন। যেখানে জায়গা আছে সেখানেই গাছ লাগাতে হবে। আর কেউ যাতে অকারণে গাছ না কাটে সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর সকলকে একটি করে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ লাগানোর জন্য আহ্বানের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী। ৯ই জুন চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলা মিলনায়তনে চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের আয়োজনে বন অধিদপ্তরের টেকসই বন ও জীবিকাভিত্তিক 'সুফল' প্রকল্পের উপকারভোগী এবং বন্যহাতির আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত ও নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর নাগরিকদের সহ-ব্যবস্থাপনায় বন রক্ষার উদ্যোগ নেয়। এ ব্যবস্থায় বনসম্পদ বৃদ্ধির পর সেই টাকার লভ্যাংশসহ ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত স্থানীয়দের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হয়। তিনি বলেন, আজকে ৩৭৭ জন বন বিভাগের উপকারভোগীদের কাছে ২৫ হাজার ২০০ টাকা করে ৯৫ লাখ টাকারও অধিক অর্থের চেক বন বিভাগের পক্ষ থেকে হস্তান্তর করা হচ্ছে। গাছ লাগালেও যে সেটি টাকায় রূপান্তরিত হয় তার প্রমাণ হলো এটি এবং আওয়ামী লীগ সরকার, শেখ হাসিনার সরকার এটি চালু করেছে। অনুষ্ঠানে বন্যহাতির দ্বারা নিহত একটি পরিবারকে নগদ ৩ লাখ টাকা, ক্ষতিগ্রস্ত ২৭ জনকে ৫ লাখ ৭০ হাজার টাকা এবং সুফল প্রকল্পের এফসিভির সদস্য ৩৭৭ জনকে মোট ৯৫ লাখ ৪০০ টাকার চেক হস্তান্তর করা হয়।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

নতুন যুগে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো গভীর সমুদ্রে জাহাজ থেকে পাইপলাইনে জ্বালানি তেল সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় নতুন যুগে প্রবেশ করছে। সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং উইথ ডাবল পাইপলাইন (এসপিএম) প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে ২রা জুলাই সৌদি আরব থেকে আনা ৮২ হাজার মেট্রিক টন ক্রু অয়েল খালাস কার্যক্রম শুরু হয়। তেল খালাসের যুগে প্রবেশ করল বাংলাদেশ। উন্নত অনেক দেশও এই প্রক্রিয়ায় তেল খালাস করতে পারেনি। ৮ হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্পের কারণে তেল খালাসে সিস্টেম লস ও খরচ কমার পাশাপাশি সময়ও বাঁচবে।

চট্টগ্রাম বন্দরের বর্তমান অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা এবং কর্ণফুলী নদীর চ্যানেলের নাব্য কম হওয়ায় মাদার অয়েল ট্যাংকারগুলো থেকে ইআরএলের ট্যাংকারে সরাসরি তেল খালাস করা সম্ভব হয় না। এর ফলে এসব ট্যাংকার গভীর সমুদ্রে নোঙর করতে হয়। এরপর ছোটো ছোটো লাইটারেজ ভেসেলের মাধ্যমে

অপরিশোধিত তেল খালাস করা হয়। এতে একেকটি জাহাজ থেকে তেল খালাস করতে সময় লেগে যায় ১১ থেকে ২০ দিন। এ পদ্ধতি সময়সাপেক্ষ, ঝুঁকিপূর্ণ ও ব্যয়বহুল হওয়ায় ২০১৫ সালে পাইপলাইন বসানোর প্রকল্পটি (সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং) হাতে নেওয়া হয়। এতে মাত্র দুইদিনেই তেল খালাস হবে। এ পদ্ধতিতে তেল খালাসে বছরে অন্তত ৮০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।

বীজ রপ্তানি করছে বাংলাদেশ

সবজিসহ নানা ফসলের বীজ এখন রপ্তানিও করছে বাংলাদেশ। কাতার, আরব আমিরাতসহ মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপ-আমেরিকায় যাচ্ছে বাংলাদেশের হাইব্রিড জাতের বীজ। সম্প্রতি এক্ষেত্রে আরেক ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। বীজের মান নিয়ন্ত্রক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল সিড টেস্টিং অ্যাসোসিয়েশনের (আইএসটিএ) স্বীকৃতি ও সনদ পেয়েছে লাল তীর সিড লিমিটেড। দেশের প্রথম কোনো বীজ পরীক্ষাগার এ সনদ পেল। সবজিসহ যে-কোনো বীজ রপ্তানি করতে বীজের মান নির্ণয় ও সনদ দেওয়ার অনুমোদিত সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল সিড টেস্টিং অ্যাসোসিয়েশন। এ পর্যন্ত বিশ্বের ৮৩টি দেশের মাত্র ১৩০টি ল্যাবরেটরি স্বীকৃতি পেয়েছে ইন্টারন্যাশনাল সিড টেস্টিং অ্যাসোসিয়েশনের, যার একটি বাংলাদেশের লাল তীরের এমএনটি বীজ পরীক্ষাগার।

লাল তীর সিড লিমিটেড প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৯৫ সালে। যা বেসরকারি খাতে প্রথম গবেষণাভিত্তিক বীজ কোম্পানি। এ পর্যন্ত লাল তীর ৩৫টি বিভিন্ন ফসলের ১৯৯টি জাত উদ্ভাবন করেছে। যার মধ্যে ৮৭টি হাইব্রিড। পাশাপাশি দেশি জাত সংরক্ষণে এ পর্যন্ত লাল তীর দেশের আনাচেকানাচে ও প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বিভিন্ন ফসলের ১ লাখ ৩০ হাজার জার্মপ্লাজমা সংগ্রহ করেছে। কৃষকদের উন্নত বীজ সরবরাহের পাশাপাশি ওমান, আরব আমিরাতসহ মধ্যপ্রাচ্য, মালয়েশিয়া, ইউরোপ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও উত্তর আমেরিকায় রপ্তানি হচ্ছে বাংলাদেশের সবজি বীজ।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাংলাদেশের পরিচয়পত্র

সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির আবেদন নেওয়ার সাড়ে তিন বছরের মাথায় স্থানীয় দূতাবাসের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) দিচ্ছে সরকার। ১০ই জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে দেশটিতে অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিকদের হাতে এনআইডি তুলে দেওয়া হয়।

আমিরাত প্রবাসী বাংলাদেশিরা প্রথমবারের মতো এনআইডি সেবা পাচ্ছেন। একইসঙ্গে দেশটিতে ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রমও শুরু হবে। প্রবাসী বাংলাদেশিরা বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠাতে চান। এনআইডি না থাকায় অনেকে হুন্ডির মাধ্যমে দেশে অবৈধ উপায়ে অর্থ পাঠান। এখন এনআইডি পাওয়ায় হুন্ডির পথ ছেড়ে বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারবে, যা দেশের রিজার্ভ বাড়াতেও ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি এনআইডি মোবাইল ব্যাংকিসহ নাগরিকদের নানা ধরনের কাজেও লাগবে। এর ফলে দেশের বাইরে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধনের ক্ষেত্রে নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়। ভবিষ্যতে এ অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে মধ্যপ্রাচ্যসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কাজের বিস্তৃতি ঘটবে।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

স্মার্ট মানবসম্পদ তৈরি করবে ওরাকল ও আইসিটি বিভাগ

ডিজিটাল ও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির দেশ গড়তে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সঙ্গে কাজ করবে ওরাকল। লক্ষ্য বাস্তবায়নে ২২শে জুন রাজধানীর আগারগাঁওস্থ আইসিটি ভবনে আইসিটি বিভাগ ও ওরাকল আনুষ্ঠানিক সমঝোতা স্মারক সই করেছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক চুক্তি প্রসঙ্গে বলেন, বাংলাদেশের আইসিটি খাত প্রায় ১০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান করেছে। ইন্ডাস্ট্রির ভবিষ্যৎ চাহিদা মেটাতে ডিজিটাল দক্ষ কর্মীবাহিনী আছে। ওরাকলের সঙ্গে কৌশলগত সহযোগিতার লক্ষ্য হচ্ছে স্থানীয় কর্মীবাহিনীকে উদ্দীপ্ত ও উদ্ভাবনী সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করা, ডিজিটাল কৌশল এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করা।

চুক্তির শর্তানুসারে, স্থানীয় মেধাবীদের ভবিষ্যতের জন্য যোগ্য করে তুলতে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আইসিটির মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগকে সহায়তা করবে ওরাকল এ্যাকাডেমি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগত বিষয়ে ওরাকল এ্যাকাডেমি থেকে সহায়তা করবে। শিক্ষাবিদরা মূল কম্পিউটিং জ্ঞান এবং সংশ্লিষ্ট ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করবে। তরুণ ও স্টার্ট-আপ উদ্যোক্তাদের মধ্যে সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বাড়াতে ওরাকল এবং আইসিটি বিভাগ যৌথভাবে হ্যাকাথন আয়োজন করবে।

স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি মূল চালিকাশক্তি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি মূল চালিকাশক্তি এবং এক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান শিক্ষার্থীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। ২২শে জুন রাজধানীর গুলশানের হুয়াওয়ে বাংলাদেশ একাডেমিতে আয়োজিত 'সিডস ফর দ্য ফিউচার' প্রোগ্রামে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। বাংলাদেশের জন্য এ বছরের 'সিডস ফর দ্য ফিউচার' প্রোগ্রাম উদ্বোধন করেছে হুয়াওয়ে সাউথ এশিয়া। এবার বাংলাদেশ পর্ব থেকে বিজয়ী প্রথম

তিনজন পুরস্কার হিসেবে পাবেন হুয়াওয়ে ল্যাপটপ, হুয়াওয়ে ট্যাব এবং হুয়াওয়ে ওয়াচ এবং শীর্ষ ৬ বিজয়ী পাবেন চীনে হুয়াওয়ে সদর দফতরে প্রশিক্ষণ সেশনে অংশগ্রহণের সুযোগ।

জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, সিডস ফর দ্য ফিউচার প্রোগ্রাম তাদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে জানার ও ব্যবহারের সুযোগ করে দিবে। তারা হুয়াওয়ের আধুনিক অবকাঠামো পরিদর্শন করবে এবং গ্লোবাল মেন্টর ও বিশেষজ্ঞদের সাথে দেখা করার সুযোগ পাবে। স্টেম ও নন-স্টেম শিক্ষার্থীদের আইসিটি বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের আইসিটি ইকোসিস্টেমের বিকাশের লক্ষ্য নিয়ে এবার দশম বারের মতো বাংলাদেশে এই প্রোগ্রাম আয়োজন করছে হুয়াওয়ে। প্রোগ্রামে অংশ নিতে আগ্রহীদের জন্য নিবন্ধন প্রক্রিয়া উন্মুক্ত করা হয়েছে।

স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারবেন। শিক্ষার্থীদের তৃতীয় বর্ষ কিংবা এর উপরে অধ্যয়নরত থাকতে হবে এবং সিজিপিএ থাকতে হবে ৩.৩-এর উপরে। এই প্রোগ্রামে নিবন্ধন করতে তাদের একটি কাভার লেটার অথবা আবেদনপত্র পাঠাতে হবে, যেখানে উল্লেখ থাকতে হবে কেন তারা এই প্রোগ্রামে অংশ নিতে চায়। এছাড়াও আবেদনপত্রে সার্বিকভাবে তাদের শেখার আগ্রহের প্রতিফলন থাকতে হবে। আবেদনপত্রসহ তাদের সিভি পাঠাতে হবে sftfbd@huawei.com এই ই-মেইলে।

২০১৪ সালে বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করে সিডস ফর দ্য ফিউচার। এরপর থেকেই এই প্রোগ্রাম আইসিটির ক্ষেত্রে তরুণদের মেধা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে ১৫ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী এ প্রোগ্রাম থেকে উপকৃত হয়েছেন।

স্মার্ট কর্মক্ষেত্র তৈরি করবে জয় সেট সেন্টার

স্মার্ট বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীদের জন্য স্মার্ট কর্মক্ষেত্র তৈরি করবে জয় সেট সেন্টার। তরুণ-তরুণীরা জয় সেট সেন্টারে প্রশিক্ষণ নিয়ে ঘরে বসে লাখ লাখ টাকা আয় করতে পারবে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। ২৪শে জুন বগুড়ার নন্দীগ্রাম উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সে এক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা জানান। এর আগে তিনি সেখানে ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন (ইডিসি) প্রকল্পের আওতায় স্মার্ট সার্ভিস, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার–জয় সেট সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের আর্কিটেক্ট সজীব ওয়াজেদ জয়ের তত্ত্বাবধানে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পেরেছি। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাজ করে যাচ্ছেন।

এছাড়া প্রতিমন্ত্রী বগুড়া শহরের টিটু মিলনায়তনে স্মার্ট কর্মসংস্থান মেলার উদ্বোধন করেন। এতে দেশের প্রথম সারির ১৩টিরও অধিক আইসিটি কোম্পানি অংশগ্রহণ করে। মেলায় আগ্রহী চাকরি প্রার্থীরা আবেদন করেছেন। প্রতিষ্ঠানগুলো সাক্ষাৎকার নেওয়ার মাধ্যমে কর্মী বাছাই ও নিয়োগ দেবে।

দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা দিতে কাজ করছে সরকার

আধুনিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবায় সরকার অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার। ২৫শে জুন জাতীয় সংসদের অধিবেশনে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য হাজী মো. সেলিমের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে মন্ত্রী এ কথা জানান। এ সময় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

মোস্তাফা জব্বার বলেন, বিশ্বের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের মানুষের কাছেও মোবাইল ফোন অত্যন্ত জনপ্রিয় ও যোগাযোগের জন্য সহজলভ্য মাধ্যম হয়ে উঠেছে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সরকার বর্তমানে মোবাইল ফোন, আইপি কলিং অ্যাপ, ওয়াইফাই হটস্পট ইত্যাদি আধুনিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও এর জন্য প্রয়োজনীয় দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা দিতে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান বিশ্বে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও আধুনিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও বিকাশ ঘটেছে। বর্তমানে দেশে মানুষের ঘরে ঘরে মোবাইল ফোন পৌঁছে গিয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল ফোনের সহজলভ্যতা, দ্রুত গতির ইন্টারনেটের ব্যবহার, অডিও-ভিডিও ইত্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

নতুন শিক্ষাক্রমে পরীক্ষা নয়, মূল্যায়ন হচ্ছে ‘উৎসব’ করে

সারা দেশে নতুন পদ্ধতিতে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে ষাণ্মাসিক মূল্যায়ন শুরু হয়েছে। আগে যেখানে হতো অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা, এ বছর জুনে শুরু হয়েছে মূল্যায়নে কার্যক্রম। মূল্যায়ন হচ্ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিখনকালীন। এর নাম দেওয়া হয়েছে মূল্যায়ন উৎসব।

জানা গেছে, সামষ্টিক মূল্যায়ন শুধু কাগজ-কলমনির্ভর পরীক্ষা হচ্ছে না। অ্যাসাইনমেন্ট, উপস্থাপন, যোগাযোগ, হাতেকলমের কাজ ইত্যাদি বহুমুখী পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন

করা হচ্ছে। নতুন শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের বড়ো অংশ হচ্ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধারাবাহিকভাবে শিখনকালীন।

নতুন শিক্ষাক্রমে 'জীবন-জীবিকা' বিষয়ে বিদ্যালয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে অংশগ্রহণ করছে শিক্ষার্থীরা। শুধু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজই নয়, এসব কাজের ওপর শিক্ষার্থীদের ১০০ থেকে ১৫০ শব্দের অভিজ্ঞতাও লিখতে হচ্ছে, যেটি মূল্যায়নের অংশ। ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের মূল্যায়ন কার্যক্রমে ল্যাপটপে বসে হাতেকলমে শিখছে শিক্ষার্থীরা । এছাড়া শিক্ষার্থীরা বাড়িতে পূর্বনির্ধারিত যেসব পারিবারিক কাজ করেছিল, সেগুলোরও ছবি তুলে বড়ো কাগজের ওপর লাগিয়ে শিক্ষককে দেখাতে হচ্ছে।

মূল্যায়ন কার্যক্রমে অংশ নিলেই বর্গাকৃতির চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হচ্ছে। আর বৃত্ত দিয়ে বোঝানো হচ্ছে একজন শিক্ষার্থী শিখেছে। আর ত্রিভুজ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে সর্বোচ্চ ভালো, অর্থাৎ ওই শিক্ষার্থীরা সব কাজে পারদর্শী।

এ বছর প্রথম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাক্রম চালু হয়েছে। আগামী বছর দ্বিতীয়, তৃতীয়, অষ্টম ও নবম শ্রেণিতে তা শুরু হবে। এরপর ২০২৫ সালে চতুর্থ, পঞ্চম ও দশম শ্রেণিতে চালু হবে। উচ্চমাধ্যমিকে একাদশ শ্রেণিতে ২০২৬ সালে এবং দ্বাদশ শ্রেণিতে ২০২৭ সালে নতুন শিক্ষাক্রম চালু হবে।

নতুন শিক্ষাক্রম আগামী বছর থেকে

শিক্ষাপদ্ধতিতে বড়ো একটি পরিবর্তন আসছে। তখন নবম শ্রেণিতে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষার মতো বিভাগ বিভাজন থাকবে না। সব শিক্ষার্থীকেই মাধ্যমিক পর্যন্ত অভিন্ন বিষয় পড়তে হবে। বিভাগ বিভাজন হবে উচ্চমাধ্যমিকে গিয়ে। এ বছর পর্যন্ত নবম শ্রেণিতে গিয়ে ঠিক হয়েছে কারা বিজ্ঞানে, মানবিকে বা ব্যবসায় শিক্ষায় পড়বে।

জিপিএর পরিবর্তে ফলাফল হবে তিন স্তরে। এর মধ্যে প্রথম স্তরকে বলা হবে পারদর্শিতার প্রারম্ভিক স্তর। দ্বিতীয় স্তরকে বলা হবে অন্তবর্তী বা মাধ্যমিক স্তর। আর সর্বশেষ, অর্থাৎ সবচেয়ে ভালো স্তরটিকে বলা হবে পারদর্শী স্তর।

অটোমোশন পদ্ধতিতে ভর্তি শুরু বেসরকারি মেডিকেলে

দেশের বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি চলছে। প্রথমবারের মতো অটোমোশন পদ্ধতিতে মেধাক্রম অনুযায়ী ভর্তি হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। ৩রা জুলাই স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যারের মাধ্যমে মেধা ও পছন্দক্রম অনুযায়ী ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়।

এই শিক্ষাবর্ষে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজের এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি ফি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নির্ধারণ করে দিয়েছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজের এমবিবিএস ও বিডিএসে নতুন ভর্তি ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ১৯ লাখ ৪৪ হাজার টাকা এবং ইন্টার্নশিপ বাবদ ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা ও টিউশন ফি বাবদ মাসে ১০ হাজার টাকা খরচ হবে শিক্ষার্থীদের। এরই মধ্যে মেধা তালিকা অনুযায়ী ক্ষুদে বার্তা দেওয়া হয়েছে শিক্ষার্থীদের।

স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে এসব কথা বলা হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষায় যারা ৪০ বা তদূর্ধ্ব নম্বর পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তিইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা অনলাইনে আবেদন করেছেন। দেশি শিক্ষার্থীদের ৩ থেকে ৯ই জুলাইয়ের মধ্যে অফিস চলাকালে ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে ভর্তি করা শিক্ষার্থীদের অনলাইনে আবেদনে উল্লিখিত পছন্দের উর্ধ্বক্রমানুসারে অটো মাইগ্রেশনের মাধ্যমে অন্য মেডিকেল কলেজে বদলির সুযোগ থাকবে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে পাঁচ নির্দেশনা

ডেঙ্গু রোধে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাসহ পাঁচ দফা নির্দেশনা দিয়ে আদেশ জারি করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর মাউশি। আদেশটি সব সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান ও মাঠপর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাদের কাছে পাঠিয়েছে শিক্ষা অধিদপ্তর। নির্দেশনাগুলো মেনে চলার অনুরোধ জানিয়েছে মাউশি।

মাউশির আদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে পাঁচ দফা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সেগুলো হলো–

- ❑ খেলার মাঠ ও ভবনগুলো নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- ❑ মাঠ বা ভবনে জমে থাকা পানি দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে।
- ❑ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য যেসব ফুলের টব রাখা হয়েছে, সেগুলো নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে।
- ❑ এডিস মশার প্রজননস্থলে যাতে পানি জমতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে।
- ❑ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকরা ডেঙ্গু প্রতিরোধের উপায় নিয়ে প্রত্যহ শিক্ষার্থীদের জানাবেন।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

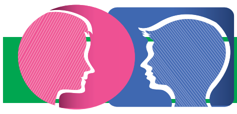

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

এশিয়ার সেরা বিজ্ঞানীর তালিকায় বাংলাদেশের দুই নারী

এশিয়ার শীর্ষ ১০০ বিজ্ঞানীর তালিকায় স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশের দুজন নারী বিজ্ঞানী। তারা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক গাউসিয়া ওয়াহিদুন্নেসা চৌধুরী ও অণুজীব বিজ্ঞানী সেঁজুতি সাহা। সিঙ্গাপুরভিত্তিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সাময়িকী *এশিয়ান সায়েন্টিস্ট* এ তালিকা তৈরি করেছে। সম্প্রতি ২০২৩ সালের তালিকা প্রকাশ করে সাময়িকীটি। ১১ই জুন বাংলাদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে এ খবরটি প্রকাশিত হয়। এ তালিকায় থাকা গাউসিয়া ওয়াহিদুন্নেসা চৌধুরী প্লাস্টিকের দূষণ এবং প্রকৃতি ও মানুষের জীবনে এর ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে একাধিক গবেষণা করেছেন। জলজ প্রতিবেশ এবং বিপন্ন প্রাণী সুরক্ষায় অবদানের জন্য তিনি ওডব্লিউএসডি-এলসিভিয়ার ফাউন্ডেশন অ্যাওয়ার্ড পান ২০২২ সালে। উপকূলীয় নারীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য কাজ করছেন তিনি। ওয়াহিদুন্নেসা চৌধুরী জুওলজিক্যাল সোসাইটি অব বাংলাদেশের সদস্য।

আরেক বিজ্ঞানী সেঁজুতি সাহা অলাভজনক প্রতিষ্ঠান চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশনের (সিএইচআরএফ) পরিচালক। তিনিই প্রথম বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের জিন নকশা উন্মোচন করেছেন। তবে এর আগে তার তাৎপর্যপূর্ণ কাজ ছিল শিশুদের নিয়ে। তিনিই বিশ্বে প্রথম প্রমাণ করেন, চিকুনগুনিয়া ভাইরাস শুধু রক্ত নয়, শিশুর মস্তিষ্কেও বিস্তার লাভ করতে পারে।

গাউসিয়া ওয়াহিদুন্নেসা চৌধুরী গণমাধ্যমকে বলেন, যে-কোনো স্বীকৃতি নতুন দায়িত্ববোধ তৈরি করে। তিনি আরও বলেন, নারীরা যে-কোনো কাজে বেশি মনোযোগী হন। তারা তাদের দায়িত্ব পালনে অনেক বেশি সচেষ্ট থাকেন। তারা যদি ভালো সুযোগ পান, তাহলে তাদের দিয়ে অনেক বড়ো অর্জন সম্ভব। বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের নারীরা এগিয়ে যাচ্ছেন বিশ্বের কাছে, এমন বার্তা যাবে বলে মনে করেন সেঁজুতি সাহা। তিনি বলেন, তালিকায় দুজনই নারী। এটা আমাকে আপ্লুত করেছে। এটা বাংলাদেশের জন্য একটি ভালো বার্তা বয়ে আনবে। বিজ্ঞানের কাজে আরও নারী এগিয়ে আসবেন। উল্লেখ্য, *এশিয়ান সায়েন্টিস্ট* ২০১১ সাল থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ২০১৬ সাল থেকে মোট ১৭টি ক্যাটাগরিতে এশিয়ার শীর্ষ ১০০ বিজ্ঞানীর তালিকা প্রকাশ করছে সাময়িকীটি।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ফেডারেল বিচারক বাংলাদেশের নুসরাত

যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আদালতে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক নুসরাত জাহান চৌধুরী নিয়োগ পেয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি মার্কিন আদালতের প্রথম ফেডারেল মুসলিম বিচারক হওয়ার রেকর্ড গড়েছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ডিস্ট্রিক আদালতের নিউইয়র্ক ইস্টার্ন ডিস্ট্রিকের ফেডারেল বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। ১৫ই জুন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার উচ্চকক্ষ সিনেট ভোটের মাধ্যমে নুসরাতের নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করে।

২০২২ সালের জানুয়ারিতে নুসরাতকে ফেডারেল বিচারক হিসেবে মনোনয়ন দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। প্রেসিডেন্টের এ মনোনয়নকে সমর্থন জানায় কয়েকটি সামাজিক ন্যায়বিচার, নাগরিক স্বাধীনতা এবং মুসলিম অধিকার সংস্থা। ৪৬ বছর বয়সি নুসরাত জাহান চৌধুরী দীর্ঘকাল যুক্তরাষ্ট্রের একটি নাগরিক অধিকার রক্ষা সংক্রান্ত আইনজীবী সংগঠন এসিএলইউ-এ কাজ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশবাহিনীসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে নাগরিক অধিকার সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে তিনি প্রচুর কাজ করেছেন। এর আগে তিনি কলোম্বিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক এবং ইয়েল 'ল স্কুল থেকে আইন বিষয়ে ডিগ্রি নেন।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংগঠন মুসলিম অ্যাডভোকেসির নির্বাহী পরিচালক ওমর ফারাহ এক বিবৃতিতে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আদালতে নুসরাত জাহান চৌধুরীর নিয়োগ অনেক কারণেই ঐতিহাসিক। নুসরাত আইনি কাজের মাধ্যমে মানুষের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য তার জীবন উৎসর্গ করেছেন।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

৮ অর্থনীতি : বিশেষ প্রতিবেদন

চামড়াজাত পণ্যে আয় বাড়ল ১৭%

তৈরি পোশাক খাতের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি আয়ের খাত চামড়া, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য। বিদায়ি অর্থবছরে (২০২২-২০২৩) রপ্তানিতে আয় বেড়েছে চামড়াজাত অন্যান্য পণ্য। গেল অর্থবছরে বেল্ট, মানিব্যাগ, লেডিস ব্যাগ, পার্স, ছেলেদের ব্যাগ ও জ্যাকেট ইত্যাদি পণ্য থেকে আয় হয়েছে ৩৯ কোটি ৬৩ লাখ ডলার, যা গত অর্থবছরের তুলনায় ১৭ শতাংশ বেশি।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) বার্ষিক তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বিদায়ি অর্থবছরে চামড়া, চামড়ার তৈরি জুতা ও চামড়াজাত অন্যান্য পণ্য থেকে মোট রপ্তানি আয় এসেছে ১২২ কোটি ডলার, যা আগের বছরে ছিল ১২৪ কোটি ৫১ লাখ ডলার। সেই হিসাবে মোট রপ্তানি আয় কমেছে ১.৭৪ শতাংশ। তবে চামড়াজাত অন্যান্য পণ্য থেকে আয় বেড়েছে ১৭ শতাংশ।

ইপিবির তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিদায়ি অর্থবছরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য থেকে রপ্তানি আয় হয়েছে ১২২ কোটি ডলার, যা ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ছিল ১০২ কোটি ডলার। সে হিসাবে গত পাঁচ বছরে এ খাত থেকে রপ্তানি আয় বেড়েছে ১৯.৬০ শতাংশ।

ইপিবির তথ্য মতে, গত পাঁচ বছরে চামড়াজাত পণ্যে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬২.৫০ শতাংশ। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে চামড়াজাত পণ্য থেকে আয় হয়েছে ২৪ কোটি ৭২ লাখ ডলার; ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আয় হয়েছে ২২ কোটি ডলার; ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আয় হয়েছে ২৬ কোটি ৫০ লাখ ডলার; ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আয় হয়েছে ২৮ কোটি ডলার এবং বিদায়ি অর্থবছরে (২০২২-২০২৩) আয় হয়েছে ৩৯ কোটি ৬৩ লাখ ডলার।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

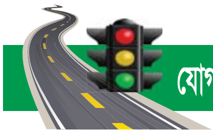

সড়কের নয় প্রকল্পে ২৯১৯ কোটি টাকার ব্যয় অনুমোদন

সড়কের নয় প্রকল্পের জন্য ২ হাজার ৯১৯ কোটি ৫৮ লাখ ৬৮ হাজার ৬০৩ টাকা ব্যয়ের অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এসব প্রকল্পের কাজ করছে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের অধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় এ ব্যয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ২২শে জুন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সভাপতিত্বে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভা হয়। সভা শেষে সভার সিদ্ধান্ত জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মো. মাহমুদুল হোসাইন খান। তিনি বলেন, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের অধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক 'টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স ফর রোড ট্রান্সপোর্ট কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরি ফ্যাসিলিটি' প্রকল্পে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যৌথভাবে এসএমইসি, ওসিজি, ডিওএইচডব্লিউএ, সিস্ট্রা, এসিই, ডিডিসি কাজ করবে। এসব প্রতিষ্ঠানকে ৭১ কোটি ৮৭ লাখ ৫৭ হাজার ২৮৭ টাকায় নিয়োগের প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

একইসঙ্গে গোপালগঞ্জের 'ঘোনাপাড়া থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ সড়কাংশ যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ' প্রকল্পের ডব্লিউপি-০১ প্যাকেজের ব্যয় অনুমোদন পেয়েছে। ওরিয়েন্ট ট্রেডিং অ্যান্ড বিল্ডিং লিমিটেড এবং হাসান টেকনো বিল্ডার্স লিমিটেড যৌথভাবে এটি বাস্তবায়ন করবে। ১৭৯ কোটি ৬৯ লাখ ৬ হাজার ৬৬ টাকায় এ কাজ বাস্তবায়নে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

সড়কের আরও যেসব ব্যয় অনুমোদন পেল

'ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট (বাংলাদেশ)' প্রকল্পের ৪(সি) প্যাকেজের ভেরিয়েশন বাবদ কোনো অতিরিক্ত ব্যয় বাড়েনি। ফলে মূল চুক্তিমূল্য ৭৫১ কোটি ৮ লাখ ৫৬ হাজার ৫১৬ টাকা সংশোধিত চুক্তিমূল্য হিসেবে ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

'সাসেক সংযোগ সড়ক প্রকল্প-২: এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ' প্রকল্পের ডব্লিউপি-০৬ প্যাকেজের পূর্ত কাজের ভেরিয়েশন বাবদ যৌথভাবে হিগো এবং মীর আক্তারকে অতিরিক্ত ১৪৩ কোটি ৯৮ লাখ ৮০ হাজার ২৩২ টাকা ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

'সাসেক সংযোগ সড়ক প্রকল্প-২: এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ' প্রকল্পের ডব্লিউপি-০৭ প্যাকেজের পূর্ত কাজের ভেরিয়েশন বাবদ আব্দুল মোমেন লিমিটেডকে অতিরিক্ত ৩২৮ কোটি ৮ লাখ ৪৩ হাজার ৯৪৬ টাকা ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন পেয়েছে।

'সাসেক সংযোগ সড়ক প্রকল্প-২: এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ' প্রকল্পের ডব্লিউপি-০৮ (লট-২) প্যাকেজের পূর্ত কাজের ভেরিয়েশন বাবদ যৌথভাবে সিপিসি এবং টানটিয়াকে অতিরিক্ত ২৫১ কোটি ১০ লাখ ৫২ হাজার ১১০ টাকা ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

'সাসেক সংযোগ সড়ক প্রকল্প-২: এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ' প্রকল্পের ডব্লিউপি-০৯ প্যাকেজের পূর্ত কাজের ভেরিয়েশন বাবদ যৌথভাবে কেএমসি এবং মনিকোকে অতিরিক্ত ২৯৬ কোটি ৬৪ লাখ ৮১ হাজার ২৯ টাকা ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

'সাসেক সংযোগ সড়ক প্রকল্প-২: এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ' প্রকল্পের ডব্লিউপি-০১ প্যাকেজের পূর্ত কাজের ভেরিয়েশন বাবদ যৌথভাবে এমএম বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড এবং ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং অতিরিক্ত ৫ কোটি ৫১ লাখ ৭১ হাজার ৩১১ টাকা ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন পেয়েছে।

'সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক পৃথক এসএমভিটি লেনসহ চার লেনে উন্নীতকরণ' প্রকল্পের ডব্লিউপি-০২ প্যাকেজের পূর্ত কাজ

যৌথভাবে আব্দুল মোমেন লিমিটেড এবং চীনের কিউটিসিএইচের কাছ থেকে ৮৯১ কোটি ৫৯ লাখ ২০ হাজার ১০৬ টাকায় ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

যুক্তরাজ্যের কৃষি খাতে বাংলাদেশিদের প্রথম দল নিয়োগ

যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম মিশনের বঙ্গবন্ধু লাউঞ্জে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে যুক্তরাজ্যের কৃষি খাতে ভবিষ্যতে আরও বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগের সুবিধার্থে সে দেশের 'মৌসুমী কৃষি শ্রমিক স্কিম'-এর সকল নিয়ম-কানুন মেনে চলার ওপর জোর দিয়েছেন।

হাইকমিশনার আশ্বস্ত করেন যে, বাংলাদেশ হাইকমিশন লন্ডন যুক্তরাজ্যে তাদের ৬ মাসের চুক্তিভিত্তিক থাকার সময় শ্রমিকদের সর্বাত্মক সহায়তা দেওয়া হবে। তিনি আরও বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগের জন্য ব্রিটিশ সরকার ও বেসরকারি খাতের সাথে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য যুক্তরাজ্যের কৃষি খাতে আরও বাংলাদেশি শ্রমিক নিয়োগের আহ্বান জানান।

যুক্তরাজ্যের 'সিজনাল এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কার্স স্কিমের' আওতায় প্রথমবারের মতো নিয়োগ পাওয়া বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য ২৬শে জুন মিশনের বঙ্গবন্ধু লাউঞ্জে বাংলাদেশ হাইকমিশন এক ব্রিফিং সেশনের আয়োজন করে।

একটি ব্রিটিশ আন্তর্জাতিক নিয়োগ সংস্থা, রিজেন্সি রিক্রুটমেন্ট লিমিটেড এই শ্রমিকদের একটি ব্রিটিশ খামারের জন্য নিয়োগ দিয়েছে। ২৭শে জুন ঢাকায় হাইকমিশনের এক বার্তায় একথা জানিয়েছে। বাংলাদেশ হাইকমিশন, লন্ডন এবং বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় দ্বারা কর্মী নিয়োগের সুবিধা ছিল।

হাইকমিশনার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার কর্তৃক আরও বিদেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য নিয়মিত অভিবাসনের জন্য গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন এবং বলেন, অভিবাসী বাংলাদেশি কর্মীরা এখন অনেক দেশে মর্যাদার সাথে কাজ করছেন এবং আরও বেশি রেমিট্যান্স উপার্জনের পাশাপাশি একটি দেশ গড়ে তুলছেন। বাংলাদেশের জন্য এটা ইতিবাচক ভাবমূর্তি।

এ উপলক্ষে রিজেন্সি রিক্রুটমেন্ট যুক্তরাজ্যের শ্রমবাজারের চাহিদা মেটাতে এই প্রকল্পের আওতায় আরও বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। সিইও উল্লেখ করেছেন যে, রিজেন্সি রিক্রুটমেন্ট লিমিটেড একমাত্র অনুমোদিত সংস্থা যা ইউকে-এর মৌসুমী কৃষি কর্মী প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশ থেকে খামার কর্মী নিয়োগের জন্য এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে বিজ্ঞাপনের বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ধরনের নিয়াগের প্রস্তাব দেয়।

তিনি প্রথম ব্যাচের কৃষি শ্রমিক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা প্রদানের জন্য লন্ডনের বাংলাদেশ হাইকমিশনকে ধন্যবাদ জানান। খামারের একজন মুখপাত্র বলেছেন, আমরা একটি পরিবার-চালিত খামার যা ৬০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করে আসছে। আমরা প্রথমবারের মতো যুক্তরাজ্যের কৃষি শিল্পের উৎস দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে দেখে আনন্দিত। আমাদের বিশ্বাস যে আরও কঠোর পরিশ্রমী বাংলাদেশিরা ভবিষ্যতে মৌসুমী শ্রমিক প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান খুঁজে পেতে পারে।

রাঙ্গামাটিতে কৃষকদের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ

খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলার দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়েছে। ২৬শে জুন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সম্মুখে দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড চেয়ারম্যান নিখিল কুমার চাকমা। অনুষ্ঠানে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান

কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তার ২২শে জুন ২০২৩ ঢাকায় সিরডাপ মিলনায়তনে 'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট কৃষির ভূমিকা' শীর্ষক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন –পিআইডি

ও খাগড়াছড়ি উপজেলার কৃষকদের মাঝে ১২টি পাওয়ার টিলার ও ২৪টি পাম্প মোটর এবং তিন জেলায় তুলা চাষ প্রকল্পের আওতায় ৭১টি স্প্রে মেশিন বিতরণ করা হয়।

কৃষকের মাঝে সার ও বীজসহ কৃষি উপকরণ বিতরণ

ঝিনাইদহ জেলায় ৭০০ কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে রাসায়নিক সার ও বীজসহ কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। ২৬শে জুন সকাল সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে কৃষি অফিসের আয়োজনে এসব উপকরণ বিতরণ করা হয়। সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাদিয়া জেরিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুর রশিদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নূর-এ-নবী, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জুনাইদ হাবীব, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আরতী দত্ত, জেলা কৃষক লীগের সভাপতি সাজেদুর রহমান সোম।

কৃষি বিভাগ জানায়, সদর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের ৭০০ কৃষকের প্রত্যেককে ১ কেজি পেঁয়াজ বীজ, ২০ কেজি রাসায়নিক সার, ২ কেজি হাইব্রিড রোপা আমন ধানের বীজসহ কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে খরিপ ২০২৩-২০২৪ মৌসুমে সরকারের প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ও রোপা আমন ধানের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এ উপকরণ দেওয়া হয়েছে।

নাটোরে কৃষি প্রযুক্তি মেলা

কৃষি প্রযুক্তির সাথে কৃষকের মেলবন্ধ তৈরির লক্ষ্যে নাটোরে অনুষ্ঠিত হয় তিন দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি মেলা। ১৫ই জুন উপজেলা হেলিপ্যাড মাঠে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন নাটোর-২ আসনের (নাটোর সদর ও নলডাঙ্গা) সংসদ সদস্য মো. শফিকুল ইসলাম শিমুল। উপজেলা নির্বাহী অফিসার সারমিনা সাত্তার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত মেলায় উপজেলার কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে নতুন প্রযুক্তির প্ল্যান্ট ডক্টর ক্লিনিক, ভার্মি কম্পোস্ট, অনাবাদি জমির ব্যবহার কৌশল,খামার যান্ত্রিকীকরণ, ফল বাগানের পরিচর্যা, পারিবারিক পুষ্টি বাগান, জৈব বালাইনাশক, ছাদবাগান, পলিনেট হাউজ, বসতবাড়িতে ফল ও সবজি চাষসহ মোট ৩০টি স্টল প্রদর্শিত হয়। মেলায় উপজেলার ৮০০ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে আমন ধানের বীজ ও রাসায়নিক সার এবং ১০০ কৃষকের মাঝে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ বিতরণ করা হয়।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতীয় বৃক্ষমেলা ২০২৩

প্রতিবছরের মতো রাজধানীতে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে পালিত হয় মাসব্যাপী জাতীয় বৃক্ষমেলা ২০২৩। ৫ই জুন থেকে ২৬শে জুন পর্যন্ত মেলা চলে। এবারের বৃক্ষমেলার প্রতিপাদ্য– ‘গাছ লাগিয়ে যত্ন করি, সুস্থ প্রজন্মের দেশ গড়ি’। মেলায় প্রাকৃতিক আবহে সবকিছু সাজানো হয়। এক নতুন বিনোদন কেন্দ্রের রূপ নেয় মেলা প্রাঙ্গণ। নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে জাতীয় বৃক্ষমেলা।

ঢাকা শহরে বাসা-বাড়িতে অল্প জায়গায় দ্রুত ফুল-ফল পাওয়া যায়

এমন বিদেশি জাতের গাছের কদর দিন দিন বাড়ছে। এবারের মেলায় বিভিন্ন স্টলে শতাধিক প্রজাতির ফল, ফুল ও শোভাবর্ধন গাছের চারা বিদ্যমান ছিল, তবে বেশি বিক্রি হয়েছে ছাদ বাগান উপযোগী গাছ। সৌখিন বাগানিরা তাদের বাগানের জন্য কিনেছেন দামি দামি বনসাই গাছ। সেসব বনসাইয়ের সর্বোচ্চ দাম সাত লাখ টাকা। মেলা কর্তৃপক্ষ জানায়, এ বছরে মেলায় মোট ১৩১টি স্টল ছিল। সরকারি ৭টি এবং বেসরকারি মালিকানাধীন ৯০টি প্রতিষ্ঠান, ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার এবং বৃদ্ধদের বিশ্রাম কক্ষ ছিল। স্টলগুলোর সাজসজ্জাতে ছিল দারুণ কারুশৈলী। স্টলগুলো দেখলে মনে হয়েছে ছোটো একটি বাগান। দুপাশে সুন্দর সুন্দর গাছ। মাঝ বরাবর হাঁটার রাস্তা।

একটি গাছ কাটলে ১০টি গাছ লাগাতে হবে

হাইকোর্ট বলেছে, একটি গাছ কাটলে ১০টি গাছ লাগতে হবে। জনস্বার্থে একান্ত প্রয়োজন হলে অনুমতি নিয়ে দু-একটি গাছ অপসারণ করা যাবে। তবে কাটার আগে গাছ লাগাতে হবে। পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় গ্রামীণ সড়ক নির্মাণের সময় ৩০টি তালগাছ উপড়ে ফেলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক শুনানিতে বিচারপতি আবু তাহের মো. সাইফুর রহমান ও বিচারপতি এ কে এম রবিউল হাসানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ ১৪ই জুন এমন অভিমত ব্যক্ত করে। জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্পের পরিচালক মো. মামুনুর রশীদের উদ্দেশে আদালত এসব কথা বলে।

প্রকল্প পরিচালকের উদ্দেশে আদালত বলে, উন্নয়ন পরিকল্পনার স্বার্থে ও মানুষের সুবিধার্থে এমন যদি হয় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, সেখানে দু-একটি গাছ অপসারণ করা যাবে। এক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি নিয়ে তা করতে হবে। তবে গণহারে গাছ অপসারণ বা কাটা যাবে না। অনিবার্য প্রয়োজনে যে গাছটা কাটবে, সে গাছের পরিবর্তে ১০টি গাছ লাগাতে হবে পার্শ্ববর্তী বা অন্য জায়গায়। একই ধরনের গাছ লাগাতে হবে। আগে গাছ লাগাবে, তারপরে কাটবে। আগে কাটবে না।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

নতুন অর্থবছরে বাড়ল বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধী ভাতা

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে মাসিক বয়স্ক ভাতা ১০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। আগে দেওয়া হতো ৫০০ টাকা। এখন পাবেন ৬০০ টাকা করে। অন্যদিকে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা নারীর ভাতা বাড়ানো হয়েছে ৫০ টাকা। আগে পেতেন ৫০০ টাকা, এখন পাবেন ৫৫০ টাকা করে। ১লা জুন প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটে দেওয়া বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এসব তথ্য জানান।

অর্থমন্ত্রী জানান, বয়স্ক ভাতা বাড়ানোর পাশাপাশি এর ভাতাভোগীর সংখ্যা ১ লাখ বাড়ানো হয়েছে। আগে ভাতাভোগীর সংখ্যা ছিল ৫৭.০১ লাখ। এ অর্থবছরে বেড়ে হয়েছে ৫৮.০১ লাখ। অন্যদিকে, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা নারী ভাতাভোগীর সংখ্যাও ১ লাখ বাড়িয়ে ২৪.৭৫ লাখ থেকে ২৫.৭৫ লাখ করা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৩.৬৫ লাখ থেকে ২৯ লাখ জনে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাসিক শিক্ষা উপবৃত্তির হারও বাড়ানো হয়েছে। যা প্রাথমিক স্তরে ৫০, মাধ্যমিক স্তরে ১৫০ ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ১৫০ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, হিজড়া জনগোষ্ঠীর ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪ হাজার ৮১৫ জন থেকে ১৮ শতাংশ বাড়িয়ে ৬ হাজার জন করা হয়েছে।

পাহাড়ের ভূমিহীনদের পাকা ঘর দিবে সরকার

প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত গৃহহীনদের জন্য পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারীদের দেওয়া হয় বিশেষ ডিজাইনের মাচাং ঘর। এবার মাচাং ঘরের পরিবর্তে পাকা ঘর দিবে সরকার। ফলে সমতল ও পাহাড়– উভয় এলাকার জনগোষ্ঠী পাবেন পাকা ঘর। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল ও অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসন করা হবে। পাশাপাশি উপকারভোগীর দারিদ্র্য বিমোচন এবং তাদের ঋণ প্রদান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের সক্ষম করে গড়ে তোলা হবে। প্রকল্পটি অনুমোদন দিয়েছে একনেক।

পরিকল্পনা কমিশন জানায়, মূল প্রকল্পটি ২০১০ সালের জুলাই থেকে ২০১৪ সালের জুন পর্যন্ত ছিল। তবে উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়ায় ধাপে ধাপে মেয়াদ বাড়িয়ে ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত করা হয়। এবার প্রকল্পের মেয়াদ নতুন করে ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। প্রকল্পের অধীনে ৩ লাখ ৬ হাজার ১১৩টি একক ঘর, ৩ হাজার ৯৭৬টি পাকা ব্যারাক, চরাঞ্চলে ৩ হাজার ৭৭১টি সিআইশিটের ব্যারাক, দেশের অন্যান্য অঞ্চলে ৩ হাজার ২২২টি সেমিপাকা ব্যারাক নির্মাণ করা হবে। এছাড়া এক হাজার ১৫৫টি কমিউনিটি সেন্টার, ২০টি টং ও ৫৮০টি বিশেষ ডিজাইনের ঘর এবং ৭০২টি ঘাটলা, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, বক্স কালভার্ট, পাকা ড্রেন ও স্লোপ প্রোটেকশন নির্মাণ করা হবে।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

বিদেশে মুক্তি পেল দেশের তিন সিনেমা

দেশে মুক্তির এক সপ্তাহ পরই আমেরিকায় মুক্তি পায় সিনেমা *প্রিয়তমা*। হিমেল আশরাফ পরিচালিত এই ছবিটি ৭ই জুলাই যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় মুক্তি পায়। স্বপ্ন স্কোয়ারক্রোর পরিবেশনায় দেশ দুটির ৪২টি প্রেক্ষাগৃহে দেখা যায় ছবিটি।

যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত এএমসি, রিগ্যাল, সিনেমার্ক, শোকেইস চেইনে ১৮টি অঙ্গরাজ্যের ৩৭টি থিয়েটারে চলে *প্রিয়তমা*। অঙ্গরাজ্যগুলো হলো– নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, পেনসিলভেনিয়া, মেরিল্যান্ড, ওহাইও, নর্থ ক্যারোলিনা, সাউথ ক্যারোলিনা, মিশিগান, টেক্সাস, ফ্লোরিডা, জর্জিয়া, টেনেসি, এলাবামা, ওকলাহোমা, কলোরাডো, অ্যারিজোনা, নেভাদা ও ক্যালিফোর্নিয়া। অন্যদিকে কানাডার চারটি প্রদেশ অন্টারিও, ম্যানিটোবা, অ্যালবার্টা ও ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় সিনেপ্লেক্স এন্টারটেইনমেন্ট চেইনে ৫টি থিয়েটারে দেখা যায় *প্রিয়তমা*।

একই তারিখে অস্ট্রেলিয়ার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিপায় আফরান নিশোর *সুড়ঙ্গ* চলচ্চিত্রটি। আফরান নিশোর *সুড়ঙ্গ* দিয়ে বড়ো পর্দায় অভিষেক ঘটে। এই ছবিটি ৭ই জুলাই অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন, ক্যানবেরা, সিডনি, ডারউইনসহ ছয়টি শহরে মুক্তি পায়।

এদিকে ৭ই জুলাই আরও একটি শুভ সূচনা হয় ঢালিউডের জন্য। গেল বছরের সবচেয়ে আলোচিত ও সফল সিনেমা *হাওয়া* মুক্তি

পেল ভারতের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম সনি লিভে। তিনটি আলোচিত সিনেমা একইদিনে ভিনদেশের পর্দায় জায়গা করে নিয়েছে, এটা নিঃসন্দেহে ঢালিউডের জন্য বিশাল সফলতা।

বর্ষা উৎসব ১৪৩০

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে শুষ্ক প্রকৃতিকে সজীবতার ভিন্নমাত্রা দিতে ষড়ঋতুর পরিক্রমায় প্রতিবছর ঘুরে ঘুরে আসে বর্ষা ঋতু। আষাঢ়-শ্রাবণের বহুমাত্রিক রূপবৈচিত্র্যে বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে এই ঋতু, রচিত হয়েছে অজস্র গান আর কবিতা। অবিরাম বাড়ি বর্ষণে স্নিগ্ধ সজীব পরশ বুলিয়ে দিয়ে প্রকৃতিতে প্রশান্তি এনে দেয় বর্ষা। প্রকৃতি রক্ষার ব্রত নিয়ে আসা বর্ষা ঋতুকে বরণ করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতিবছরের মতো এবারো ১৫ই জুন বর্ষা উৎসবের আয়োজন করে বর্ষা উৎসব উদ্‌যাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মানজার চৌধুরী। আষাঢ়স্য প্রথম দিবসটি এবার উদ্‌যাপন করা হয় গেন্ডারিয়া থানাসংলগ্ন মিল ব্যারাকের বুড়িগঙ্গা নদীর ওপর নির্মিত জেটিতে। প্রতিবছরের মতো এবারও অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় যন্ত্রসংগীত শিল্পী হাসান আলীর বাঁশি বাজানোর মধ্য দিয়ে।

বর্ষাকথন পর্বে অংশগ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. আখতারুজ্জামান, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৪৬নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র শহীদুল্লাহ মিনু। আলোচক হিসেবে ছিলেন বর্ষা উৎসব উদ্‌যাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মানজার চৌধুরী, এটিএন বাংলা লিমিটেডের অ্যাডভাইজার (প্রোগ্রাম অ্যান্ড ট্রান্সমিশন) তাসিক আহমেদ। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ড. নিগার চৌধুরী।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

রেকর্ড জয় বাংলাদেশের

আফগানিস্তানের বিপক্ষে মিরপুরে একমাত্র টেস্টে বিশাল ব্যবধানে জয় পেল বাংলাদেশ। টাইগারদের দেওয়া ৬৬২ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে তৃতীয় দিনের শেষ সেশনেই ২ উইকেট হারায় আফগানরা। ১৭ই জুন চতুর্থ দিনে অলআউট হয় ১১৫ রানে। আর তাতেই এল স্বাগতিকদের ৫৪৬ রানের জয়, যা দেশের টেস্ট ইতিহাসে রেকর্ড ব্যবধানে জয়। শুধু এই নয়, রানের হিসাবে এটি কোনো দলের টেস্ট ইতিহাসের তৃতীয় বৃহত্তম জয়।

১৪৬ বছর ও ২৫০৭ ম্যাচের সুদীর্ঘ টেস্ট ইতিহাসে রানের হিসাবে সবচেয়ে বড়ো হারের বিব্রতকর রেকর্ড টেস্টের বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার। সেটিও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইংল্যান্ডের বিপক্ষে নিজেদের আঙিনায়। ১৯২৮ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে ব্রিসবেনের প্রদর্শনী মাঠে অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ডের কাছে ৬৭৫ রানে হেরেছিল ডন ব্র্যাডম্যানের অস্ট্রেলিয়া। ১৯৩৪ সালের আগস্টে লন্ডনের দ্য ওভালে ফিরতি অ্যাশেজের শেষ টেস্টে বব ওয়াটের ইংল্যান্ডকে ৫৬২ রানে হারিয়ে ব্রিসবেন ট্র্যাজেডির মধুর প্রতিশোধ নেয় অস্ট্রেলিয়া। রানের হিসাবে যা এই সংস্করণে দ্বিতীয় বৃহত্তম জয়।

রেকর্ডের সোনালি পাতায় সাদা-কালো যুগের এ দুই জয়ের পরই এখন জ্বলজ্বল করছে বাংলাদেশের নাম। ১৭ই জুন মিরপুরে ঢাকা টেস্টের চতুর্থ দিনে আফগানিস্তানকে ৫৪৬ রানে হারিয়ে বাংলাদেশ পেয়েছে নিজেদের সবচেয়ে বড়ো ও টেস্ট ইতিহাসের তৃতীয় বৃহত্তম জয়।

৩৩ পদক জয় বাংলাদেশের

বার্লিন স্পেশাল অলিম্পিক গেমসে ২৪টি স্বর্ণসহ ৩৩টি পদক জিতেছেন বাংলাদেশের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ক্রীড়াবিদরা। জার্মানির রাজধানীতে ২৫শে জুন সমাপ্ত হওয়া গেমসে অভূতপূর্ব ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করে আটটি ডিসিপ্লিনে ২৪টি স্বর্ণ, চারটি রূপা ও পাঁচটি ব্রোঞ্জপদক জয় করেন লাল-সবুজের ক্রীড়াবিদরা। মেয়েদের ফুটবল, হ্যান্ডবল, ইউনিফায়েড ভলিবলে বাংলাদেশ দল চ্যাম্পিয়ন হয়।

অ্যাথলেটিক্সে ছয়টি স্বর্ণ, তিনটি রূপা, ব্যাডমিন্টনে পাঁচটি স্বর্ণ, বোচিতে ছয়টি স্বর্ণ, সাঁতারে চারটি স্বর্ণ, তিনটি ব্রোঞ্জ এবং মেয়েদের বাস্কেটবল ও ছেলেদের হ্যান্ডবলে ব্রোঞ্জ জয় করে স্পেশাল অলিম্পিকে বাংলাদেশের ক্রীড়া দল।

পাকিস্তানকে পরাস্ত করে ফাইনালে বাংলাদেশ

বৃষ্টির দরুন ২০ ওভারের ম্যাচ কমে এল নয় ওভারে। এমন খুদে ম্যাচে পাকিস্তানকে ছয় রানে হারিয়ে মেয়েদের ইমার্জিং এশিয়া কাপের ফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ। ২০শে জুন হংকংয়ের মংককে অনুষ্ঠিত রোমাঞ্চকর ম্যাচে পাকিস্তানকে ছয় রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে আগে ব্যাট করে ৯ ওভারে বাংলাদেশ করে মাত্র ৫৯ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৪ উইকেটে ৫৩ রানে থেমে যায় পাকিস্তান। ফলে বাংলাদেশ নারী ইমার্জিং দল ৬ রানের সহজ জয় পায়।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

চলে গেলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী বুলবুল মহলানবীশ

আফরোজা রুমা

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক বুলবুল মহলানবীশ না ফেরার দেশে চলে গেলেন। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর ১৪ই জুলাই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

১৯৫৩ সালের ১৪ই মার্চ বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন কৃতী শিল্পী ও সংগঠক বুলবুল মহলানবীশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও মাস্টার্স করেন তিনি। দেশে-বিদেশে শিক্ষকতা করেন দীর্ঘদিন। শিল্পী, নাট্য, আবৃত্তিশিল্পী ও উপস্থাপক হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল। পাশাপাশি তিনি টেলিভিশন-বেতার-মঞ্চে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা করতেন।

বাংলাদেশ স্বাধীনতার ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে বুলবুল মহলানবীশের নাম। তিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক হিসেবে কাজ করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিকেলে সেই সময়কার রেসকোর্স ময়দানে যখন পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী আত্মসমর্পণ করছিল, ওই সময় কলকাতার বালিগঞ্জের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয় বিজয় নিশান উড়ছে ঐ গানটি। কালজয়ী এই গানের শিল্পীদের একজন বুলবুল মহলানবীশ। পরবর্তী সময়ে জীবনের পুরোটাই তিনি সংগীতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া লেখালেখিতেও বিকশিত করেছেন নিজেকে। তাঁর লেখা প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১২টি। 'মুক্তিযুদ্ধের পূর্বপ্রস্তুতি' ও স্মৃতি ৭১' তাঁর বহুল আলোচিত বই।

সাংগঠনিক পদেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন বুলবুল মহালানবীশ। নজরুল সংগীতশিল্পী পরিষদের সহ-সভাপতি, রবীন্দ্র একাডেমির সাধারণ সম্পাদকসহ জাতীয় কবিতা পরিষদ, উদীচী বিভিন্ন সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তবে সব ছাপিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী-কণ্ঠযোদ্ধা পরিচয়টি বহন করেন বিনম্র গৌরবে।

সাহিত্য-সংস্কৃতিতে অবদানের জন্য পেয়েছেন চয়ন স্বর্ণপদক, দেওয়ান মোহাম্মাদ আজরফ ফাউন্ডেশন সম্মাননা, পশ্চিমবঙ্গের নজরুল একাডেমি সম্মাননা পদক।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের খ্যাতিমান শিল্পী এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা বুলবুল মহলানবীশের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর শোকবার্তায় বলেন, বুলবুল মহলানবীশ একাধারে কবি, লেখক, গায়ক, আবৃত্তিশিল্পী, অভিনেতা এবং টেলিভিশন-বেতার-মঞ্চে শিল্প-সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ছিলেন। তিনি ছিলেন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তিনি আরও বলেন, বুলবুলের মৃত্যুতে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। বিখ্যাত এই শিল্পী তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর কাছে বেঁচে থাকবেন।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

নবারুণ

মোবাইল অ্যাপ্স-এ নবারুণ পড়তে স্মার্ট ফোন থেকে **google play store**-এ **nobarun** লিখে মোবাইল অ্যাপ্স ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 44, No. 01, July 2023, Tk. 25.00

সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ৭ই জুলাই ২০২৩ ঢাকায় আগারগাঁও মেট্রোরেল স্টেশনে এমআরটি লাইন-৬ এর আগারগাঁও হতে মতিঝিল অংশে মেট্রোরেল চলাচল পরীক্ষণের শুভ সূচনা করেন– পিআইডি

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

তথ্য ভবন

১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০

www.dfp.gov.bd